দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু শাস্ত্রে দশাবতারের অন্যতম ভগবান বুদ্ধদেব
—পৃ ২৩

রামনবমীর শোভাযাত্রায় পরিকল্পিত হিংস্রতার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস
—পৃ ৩৫

৭৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ১ মে, ২০২৩।। ১৭ বৈশাখ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১ মে - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দুর্জনের অংশীদারি পাপ, তাই পরিত্রাণের সুযোগ নেওয়া উচিত ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মুকুল কোন কূলে, দিদিই গেছেন ভুলে ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

জাতি, উপজাতি আর কোটার বিষয়টায় মনোযোগ দরকার ◻ মনু আইয়াপ্পা কানথানডা ◻ ৮

আতিক আহমেদের হত্যা ও আল কায়দার হুমকি ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

আতিকদের জন্য উত্তরপ্রদেশে এক যোগী আছেন, আর আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে? ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

বিশ্বকর্মার সৃষ্টিকর্মের ওয়ার্কশপ এবং ভারতীয় শ্রমিক দিবস ◻ কল্যাণ গৌতম ও সৌকালীন মাঝি ◻ ১৩

চীনের জনগণের কাছে ভালোবাসার আর এক নাম মোদী লাওস্কিয়ান ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

দেশের আর্থিক উন্নয়ন বিশ্বায়নের হাত ধরেই ◻ তারক সাহা ◻ ১৭

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কিছু প্রশ্ন ◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ১৮

হিন্দুশাস্ত্রে দশাবতারের অন্যতম ভগবান বুদ্ধ ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ২৩

আলোর পথিক গৌতম বুদ্ধ ◻ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৫

বুদ্ধপূর্ণিমা এখন হিন্দুদের কাছেও পরম পবিত্র ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ২৬

তথাগত বুদ্ধের নীতিশিক্ষা বেদের নীতিশিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ◻ দীপক খাঁ ◻ ২৮

ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৩১

হিন্দুধর্মই মানবধর্ম : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ◻ অমিত ঘোষ দস্তিদার ◻ ৩৩

রামনবমীর শোভাযাত্রায় পরিকল্পিত হিংস্রতার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৫

অমরনাথের পথে ◻ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ খেলা: ৩৮ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৮ মে ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৮ মে ২০২৩

জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ

বামপন্থীরা দাবি করেন রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র নামক কোনও কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। বলা বাহুল্য, কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ যে মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বে যে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল তার প্রমাণ আমরা তাঁর রচনায় পেয়েছি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কয়েকটি আলোচনা। লিখেবেন— ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, পিন্টু সান্যাল প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

করুণাসিন্ধু

পৃথিবীতে যখন মানবতা লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত হয়, মানুষ হানাহানিতে মাতিয়া ওঠে, তখনই কোনো মহামানবের আবির্ভাব হয়। তিনি মানুষকে বোধ বুদ্ধি প্রদান করিয়া জগতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের ইহা শাস্ত্রবাক্য। ভগবানের ইহা শাশ্বত বাণী। তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার দ্বারাই মানুষের মুক্তি সম্ভব বলিয়া মনে করা হইত। যাগ,যজ্ঞ ও পশুবলি দিয়া দেবতাকে খুশি করিতে পারিলেই অলৌকিক শক্তিবলে সদ্‌গতি লাভ করা যাইবে, এই ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধেই পরম কারুণিক তথাগত বুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রেম কোথায়? সাধু কর্ম কোথায়? সাধু বাক্য কোথায়? সাধু চিন্তন কোথায়? তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া কঠোর তপস্যায় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া দুঃখতাড়িত মানুষকে জানাইলেন, সর্বম্ দুঃখম্। এই জগৎ দুঃখময়। কিন্তু দুঃখের কারণ রহিয়াছে, দুঃখের নিবৃত্তি রহিয়াছে এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় রহিয়াছে। ইহার জন্য তিনি নিজেকে মানুষের মধ্যে উপনীত করিলেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা ঘোষণা করিলেন। দুঃখকে জয় করিবার জন্য প্রেমের কথা বলিলেন। বলিলেন, মানুষ যদি নিজেকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে জগতের কল্যাণে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিবে। তখনই বিশ্বজনীনতার বোধ তাহার মধ্যে বাস্তবে প্রতিফলিত হইতে পারিবে। তিনি সত্য, করুণা ও প্রেমের দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্বে প্রেম ও সত্যের বাণীতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া আলোর পথ দেখাইলেন। প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের জন্য তিনি বাণী দিলেন – অপ্প দীপো ভব। মুক্তিকামী মানুষের মনে তিনি আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাইলেন। এই মহামানব মানুষের দুঃখের নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দীপশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষই শুধু আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তিনি এশিয়া মহাদেশের আলোক শিখায় পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে ভারতবর্ষের পদপ্রান্তে উপনীত করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর আসন লাভ করিয়াছিল।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী তথাগত তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি করুণার প্রতিমূর্তি। বুদ্ধ অনুগামীদের মন্ত্র — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি এবং সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তাহার তিনটি অভিমুখ রহিয়াছে। ধর্মে রহিয়াছে জ্ঞান, সঙ্ঘে রহিয়াছে কর্ম এবং বুদ্ধে আশ্রিত রহিয়াছে করুণা তথা ভক্তি। এই করুণা ও ভক্তিই বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করিয়াছিল। এই করুণা , শরণাগতি, প্রেম ও ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এশিয়ার দেশগুলি এই ধর্মকে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিল। এবং ইহা তাহারা নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণ করিয়া সর্বজনের অন্তরের সম্পদ করিয়া লইয়াছিল। এই মহান সন্তানের জন্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে ভারতভূমি। বেদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী হইলেও ভারতবর্ষ তাঁহাকে নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, পূজা করিয়াছে। ভারতবিরোধী বৈদেশিক মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু-বৌদ্ধকে পৃথক করিবার চেষ্টায় তৎপর রহিয়াছে। ইহা তাহারা করিতেছে নিজেদের স্বার্থেই। কেননা স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের অভিধানে প্রেম, করুণা, ভক্তি ও মানবতার কল্যাণের মতো শব্দগুলি অনুপস্থিত। শব্দগুলি তাহারা ব্যবহার করেন নিজ স্বার্থ পরিপূর্তির জন্যই। আর তাহার পূর্তির জন্য তাহারা হিংসাকেই পাথেয় করিয়াছে। যাহা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের একেবারেই বিপরীত। তাঁহারা বিভাজনের যতই অপচেষ্টা করুন, তবু ভারতবর্ষের অন্তরে করুণা, প্রেম, ভক্তি পূর্ণরূপেই বিরাজ করিবে। কারণ তথাগত বুদ্ধকে এই হিন্দু-ভারতই প্রসব করিয়াছে। তিনি হিন্দুদিগের অবতার-পুরুষ। বুদ্ধপূর্ণিমা চিরকাল হিন্দু-বৌদ্ধকে সম্পৃক্ত রাখিবে।

সুভাষিতম্

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নতি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।

সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্চতে।। (বিদুরনীতি)

শীত-গ্রীষ্ম, ভয়-অনুরাগ এবং সম্পদে-বিপদে যার বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, তাকেই পণ্ডিত (জ্ঞানী) বলা হয়।

দুর্জনের অংশীদারি পাপ তাই পরিত্রাণের সুযোগ নেওয়া উচিত

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ঘটিয়ে ফেললে অস্বীকার করেন না। তার প্রমাণ চান। কারণ তিনি জানেন আইনবিরুদ্ধ বিষয় প্রমাণ করা যায় না। তৃণমূলের জাতীয় তকমা বাতিল নিয়ে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তার টানাপোড়েন হয়। মমতা বাঘা ওল হলে শুভেন্দুবাবু বুনো তেঁতুল। মমতার রাজনৈতিক আদব কায়দা তাঁর রপ্ত। পরিণত রাজনীতিক হিসেবে তিনি মমতার প্যাঁচে পড়েননি। শুধু জানান দিয়েছেন যে মমতার রাজনীতির খাসখবর তিনি রাখেন। রাজ্যের বিরোধী দলেরা সকলে সমান ভালো না হতে পারে। তবে শাসক তৃণমূল যে তাদের চেয়ে খারাপ এই ধারণা মানুষের মনে দানা বাঁধছে।

সিপিএমের শেষ বেলায় এরকম দেখেছিলাম। কেউ বলতেন না মমতা ভালো, সবাই বলতেন সিপিএম খারাপ। পার্টি কর্মীরা নরম হয়ে বলতেন, ধাক্কা খাওয়া উচিত। মমতা জমানার বারো বছরে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। জমানা পালটাতে বা ওলটাতে বিরোধীদের সামনে সুযোগ এসেছে। মমতা নিজে বুঝলেও কাউকে বুঝতে দেন না। এক বছর ধরে দলের নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দেখে ক্লান্ত আর বিষণ্ণ মমতা। 'দুর্নীতি রানি'-র বদনামও কুড়িয়েছেন। কেউ তাঁকে ডাকে 'চোরের রানি' বলে। এই দুর্নাম তাঁর কোনোভাবেই প্রাপ্য নয়। যদি পেয়ে থাকেন তার জন্য তাঁর দুর্বলতা আর ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী। অনেকের দাবি, মমতা হাল ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে চাইছেন। পালাই পালাই বা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের ভাব।

তাঁর তুলনায় বহুগুণে দুর্বল আর অযোগ্য সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তিনি ব্যাটন তুলে দিতে চাইছেন। এটা হাস্যকর। ভাবতেও অবাক লাগছে ২০২৩-এর 'পরীক্ষার পঞ্চায়েত ভোটে' তৃণমূলের মুখ অভিষেক। মমতা চালচিত্র। মাত্র বারো বছর আগে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় ৩৫ বছরের অভিষেকের। অনেকটা নিরুপায় হয়েই হয়তো মমতা অভিষেককে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন। তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা। আগামী দিনে যদি কোনো জাতীয় দলের লেজুড় হয়ে তৃণমূলকে থাকতে হয় মমতা হয়তো তাতেও রাজি থাকবেন। মমতার দলের চারজন বিধায়ক, এক মন্ত্রী আর নামজাদা এক নেতা জেলে রয়েছেন। তালিকাটা ক্রমশ দীর্ঘ হবে। তবে অভিষেকের উত্থান তাঁর নিজের কাছে চ্যালেঞ্জ হলেও মমতা ভালো জানেন বিরোধীরা এর সুয়োগ কতটা নিতে পারে।

আর সব জেনেও মমতা পথ বের করতে পারছেন না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন দুর্নীতির জাল মমতাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। পরিত্রাণের রাস্তা নেই। দিশাহীন মমতা নিজের দলের নেতা আর মন্ত্রীদের বিরাগভাজন হয়ে উঠছেন। তাঁর দক্ষিণহস্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পার্কিং ফি-র সিদ্ধান্ত না-মঞ্জুর করা তার বড়ো প্রমাণ। অনেকের দাবি অভিষেকবাবুর প্ররোচনাতেই নাকি মমতা এই সিদ্ধান্ত নেন। অভিষেকের সঙ্গে ফিরহাদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত দূরত্ব অনেকটাই। দুর্জনের সঙ্গে অংশীদারি উচিত নয়—এটি একটি মহাবাক্য। রাজ্য- রাজনীতির আঙিনায় তা কতটা উপযোগী তা বিচারের বিষয়। উপরিউক্ত কথার সহজ উত্তর হয়তো 'কোনো বিকল্প নেই বলে'। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষকে চিহ্নিত করতে হবে কে বা কারা এই দুর্জন। তবেই ধরা পড়বে এই রাজ্যের মানুষ বিকল্প চান কি না।

রাজনীতির জটিল পাঁকে আটকে থাকা এ রাজ্যের মানুষের স্বভাবসুলভ হয়ে গিয়েছে। তা থেকে ত্রাণ পাওয়া সহজ নয়। এমন হতে পারে শাসক তৃণমূল বনাম বিরোধী শিবিরের লড়াইয়ে বিকল্প রাজনীতির সন্ধান এই রাজ্যের বিরোধীরা এখন দিতে পারেননি বলেই মানুষ তা থেকে সরে রয়েছে। সামনেই গ্রামবাঙ্গলার পঞ্চায়েত ভোট। বিধানসভার নিরিখে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে আনুমানিক ১৫০টি রয়েছে এই গ্রামবাঙ্গলায়। পঞ্চায়েত ভোট মমতার অগ্নিপরীক্ষা। মমতা ভালো জানেন বিরোধী শক্তির মধ্যে সিপিএম বা কংগ্রেস এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলে তাঁর বা তাঁর পরিবারের কী দুরবস্থা হতে পারে। আর রাজ্যের পরাক্রমী দ্বিতীয় শক্তি বিজেপির উত্থান হলে তা তাঁকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে দল বাঁচলেও তিনি আর তাঁর পরিবার হয়তো অস্তিত্বহীন হয়ে যাবেন। □

> **নিরুপায় হয়েই হয়তো মমতা অভিষেককে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন। তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা। ... মমতার দলের চারজন বিধায়ক, এক মন্ত্রী আর নামজাদা এক নেতা জেলে রয়েছেন। তালিকাটা ক্রমশ দীর্ঘ হবে।**

মুকুল কোন কূলে দিদিই গেছেন ভুলে

বিস্মরণেষু দিদি,

আপনার ভুলোমন নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। আমি কিন্তু বলি না। নিন্দুকেরা বলেন, আপনি নাকি ইচ্ছা করে ভুলে যান। কিন্তু আমি জানি, সাত-পাঁচ মাথায় রাখতে গিয়ে আপনার মনের অতলে তলিয়ে যায় অনেক স্মৃতি। এককালে বনধ্ ডাকার রানি ছিলেন, টাটাকে তাড়ানো থেকে পার্থ-বান্ধবী অর্পিতার মুখ এসব ভুলে যাওয়ার কথা আপনাকে আমি এখন আর স্মরণ করাতে চাইছি না।

কিন্তু দিদি মুকুল এখন কোন কূলে? মুকুল মানে মুকুল রায়। সেই যাঁকে আপনি অনেক আদর করে দলে ফিরিয়েছিলেন! মনে পড়ছে দিদি? সেই যে ২০২১ সালের ১১ জুন। দাঁড়ান মনে করাই।

কলকাতায় থাকার সময় মুকুল তৃণমূলেই ছিলেন। তবে বিধানসভার ভিতরে গিয়ে তিনি বিজেপির গা ঘেঁষে বসেন। সেটাও অবশ্য শুনেছি আপনার নির্দেশেই। কারণ, তা না হলে আইনের চোখে ফেঁসে যাবেন। কিন্তু মুকুল যেই দিল্লি গেলেন, কেন গেলেন অবশ্য কেউ জানে না, বলতে শুরু করলেন, 'আমি বিজেপিতে ছিলাম, আছি, থাকব।' বিজেপি অবশ্য এ সবে টলছে না। আর আপনি নবান্নে বসে বললেন, 'উনি তো বিজেপির বিধায়ক।'

তবে কি দিদি আপনি ওই দিনটাকে ভুলে যেতে চাইছেন? আমি কিন্তু ভুলিনি। সেদিন আমার বুক আপনার সাফল্য এবং মমতাময়ী মন থেকে ফুলে উঠেছিল। গর্বে মাটিতে পা পড়ছিল না। তৃণমূলের সবাই বলছিল, 'দেখ, কেমন দিলাম!' আমি অবশ্য বলেছিলাম, 'নন্দীগ্রামে গিয়ে পা ভাঙা থেকে বিজেপির বিধায়ক ভাঙা আমার দিদিতো সব পারেন।'

সব মিলিয়ে তৃণমূল এখন ২০২১ সালের ১১ জুনের ঘটনাকেই অস্বীকার করতে চাইছে। ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়। তার এক মাস কাটতেই মুকুল তৃণমূল ভবনে গিয়ে মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন। অনেক দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার মতো উৎসাহ দেখা গিয়েছিল তৃণমূল শিবিরে। মুকুল তখন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদে। তৃণমূল সেটাই প্রচার করেছিল যে, বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় তৃণমূলে যোগ দিলেন। হ্যাঁ দিদি, আমার মনে আছে, আপনার ভাইপো এমনটাই টুইটে লিখেছিলেন। সঙ্গে প্রচার করা হয়েছিল একটি ছবি। তৃণমূল ভবনে মাস্ক খুলে বক্তব্য রাখছেন মুকুল। পাশেই বাঁ দিকে বসে অভিষেক। ডান দিকে একটু দূরে মমতা। আর মুকুলের ঠিক পিছনে বসে রয়েছে পুত্র শুভ্রাংশু রায়।

প্রমাণ চাই দিদি! সেই দিনটার কথা মুকুলও আর উল্লেখ করতে না চাইলেও, নিজেকে বিজেপি বিধায়ক বলে দাবি করলেও, তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলের কভারে রয়ে গিয়েছে ২০২১ সালের সেই ছবিটা। এমনকী, মুকুলের নামের তলায় পরিচয়েও লেখা, 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'। মুকুলের প্রোফাইল ছবিটিও সেই 'ঘরে ফেরা'র দিনের। তৃণমূলে যোগদানের পরেই বিজেপি পরিষদীয় দল দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন করে। কিন্তু স্পিকার তাতে সাড়া না দিয়ে মুকুলকে 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি' (পিএসি)-র চেয়ারম্যান করে দেন। সাধারণভাবে যা প্রধান বিরোধী দলের কোনও বিধায়ককে করা হয়, তা নিয়েও মামলা করে বিজেপি। এর পরে মুকুল নিজের থেকে ওই পদ ছেড়ে দিলে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জ থেকে জয়ী কৃষ্ণ কল্যাণীকে বসান স্পিকার। তবে তার পরে কৃষ্ণও তৃণমূলে যোগ দেন। মুকুলেরই কারসাজিতে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেন, 'মুকুল রায় বিজেপি বিধায়ক। মুকুল রায় বিজেপির বলেই তো তাঁকে পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে কোনও প্রমাণ নেই।' কিন্তু দিদি, বড়ো প্রমাণ যে রয়ে গিয়েছে। সেটা মুকুলের টুইটার হ্যান্ডেলেই। তবে সে দিনের অন্য ছবিরও কিন্তু অভাব নেই। পুরনো ছবি গুগ্‌লে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। ভাইপোর টুইটারেও। যদি না ডিলিট করে থাকেন।

তবু আপনি ভুলেই থাকুন। একটা লোক নিজে নিজে টিকিট কেটে বিমানে চেপে দিল্লি গেলেন। সবার সঙ্গে কথা বললেন। তার পরেও প্রথমে বলা হলো 'নিখোঁজ'। পরে বলা হলো 'অপহরণ' করা হয়েছে। আপনার পুলিশও সেই মতো তদন্ত করছে। এখন মুকুলকে 'পাগল' প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। ঠিকই করেছেন দিদি। 'পাগল' প্রমাণ করতে পারলে মুকুল কিছু ফাঁস করলে সে সবের গুরুত্ব কমে যাবে। তবে দিদি, আর কিছু ফাঁস হতে কি বাকি রয়েছে?

যাক। আমি আপনার মনের উপরে চাপ বাড়াতে চাই না। যে জিনিস মনে রাখলে মনকে কষ্ট দেয় তা ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। আপনি বরং এখন অন্য একটা কথা পারলে ভুলে যান। সত্যি করে বলছি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নটা ভুলে যান। কারণ, যা হাওয়া দেখছি, আপনার অবসরের বয়স পার হয়ে গেলেও দিল্লি অনেক দূরেই থেকে যাবে।

অতিথি কলম

মনু আইয়াপ্পা কানথানডা

জাতি উপজাতি আর কোটার বিষয়টায় মনোযোগ দরকার

কর্ণাটকের উচ্চমার্গের নাটক, ততোধিক উচ্চ রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পন্ন নির্বাচনকে ৬টি নির্দিষ্ট বিন্দুর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯৮৫ সাল থেকে কর্ণাটকের নির্বাচকমণ্ডলী একরকম নিয়মই করে ফেলেছে যে চলতি যারা ক্ষমতায় থাকবে বর্তমান ভোটে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। গতকাল কর্ণাটকে মনোনয়ন পেশ করার শেষ দিন ছিল। ১০ মে ভোট আর ১৩ মে ফল প্রকাশ। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এটা ভেবে বেশ পরিতৃপ্ত বোধ করছে যে ক্ষমতায় থাকার কুফল এবারের নির্বাচনে নিশ্চিত প্রভাব ফেলবে। তারা ইতিমধ্যেই সেখানকার বাসবরাজ বোম্মাই পরিচালিত বিজেপি সরকারকে দেশের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বলে আখ্যা দিয়ে রেখেছে। কংগ্রেস এই সরকারকে ৪০ শতাংশ কমিশনের সরকার বলছে। সেখানকার রাজ্য ঠিকাদারদের সংগঠন সরকারের ওপর ঘুষ নেওয়ার দায় চাপিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ দাখিল করার প্রশ্নে বিরোধীরা ও ঠিকাদার সংগঠন কেউই কিছু দেখাতে পারেনি। এর ফলে বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযোগকে নির্জলা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকারের তত্ত্ব প্রয়োগে প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের বিষয়েও হাত লাগিয়েছে। ভোকালিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাড়ানোর সঙ্গে লিঙ্গায়েত (ওবিসি), তপশিলি জাতি উপজাতিদের সঙ্গে দলিতদের সংরক্ষণও বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল কিন্তু রাজনৈতিক মেরুকরণ কতটা সফল হয়েছে সেটাও ইঙ্গিত করবে। যেমন হিজাব পরা, অষ্টাদশ শতাব্দীর মহীশূরের শাসক টিপুর হিন্দুদের প্রতি ভূমিকা বা সাভারকরের অবদান সব কিছুই থাকবে।

একটা প্রশ্ন আসে বিজেপি থেকে এত লোক বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? নয় নয় করে ২০টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে দল বিদ্রোহের মুখে পড়েছে। এর প্রধান কারণ দল কোনোভাবে কালিমালিপ্ত রাজনীতিবিদদের পারিবারিক শাসনে আগ্রহী বা অতি প্রাচীন প্রার্থীদের জায়গায় তরুণ মুখ দিতে ইচ্ছুক। এই পরিবর্তনের ডাক দলে একেবারে শেষ মুহূর্তে দেওয়া হয়েছে। অতি প্রবীণ দলীয় কর্তা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেটিয়ার ও উপমুখ্যমন্ত্রী লক্ষণ শাবদী সঙ্গে আরও ১২ জনকে নিয়ে দল ছেড়েছেন। তারা নিজেদের বিরোধী খোলাখুলি ঘোষণা করে গেছেন। তারা ভালোই জানেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে কোনো বড়ো ধাক্কা দিতে পারবে না, কেননা নির্বাচন ১ মাসও নেই। বিজেপি এখানে একটা ভুল করেছে, তারা এই ব্যাপারটা অন্তত ৩ মাস আগে করতে পারত।

বিজেপির এই বিরোধী ও দলছুটদের কংগ্রেস কতটা নিজের উপকারে লাগাতে পারবে? মনে রাখা দরকার, গত বছরের গুজরাট নির্বাচনে বিজেপি ৫০ জন চলতি বিধায়ককে নির্বাচনী টিকিট দেয়নি। কর্ণাটকের ক্ষেত্রে এই মডেলকে তারা অনেক ছোটো করে ১৮ জন বিধায়ককে মনোনয়ন দেয়নি। ১৮৯ জন প্রার্থীর মধ্যে দল ৫২টি নতুন মুখ নিয়ে এসেছে। কিন্তু বেশ কিছু প্রভাবশালী লিঙ্গায়েতের কংগ্রেসে যোগদান বিজেপির ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। এই বিপর্যয় উত্তর কর্ণাটকের ক্ষেত্রে বেশি সম্ভব। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বিজেপি অতীতে কখনও কর্ণাটকে এককভাবে সাধারণ গরিষ্ঠতা পায়নি। অন্যদিকে অনেক আগের কংগ্রেসের লিঙ্গায়েতি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তিন দশক আগে তৎকালীন রাজীব গান্ধী কর্তৃক অত্যন্ত অপদস্থ হয়ে দল থেকে বিতাড়িত হন। এই পরিস্থিতি এত দীর্ঘকাল চলার পর আজ হঠাৎ দু'জন সেই সম্প্রদায়ের লোক হঠাৎ কংগ্রেসভুক্ত হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস নতুন সমীকরণ সন্ধান করছে।

এখন বিজেপিকে যে নতুন কোটা তৈরির ব্যবস্থা তারা করেছে সেটা কতদূর সাফল্যের মুখ দেখাবে সেটা দেখার। ভোট ঘোষণা হবার ৭ দিন আগে কর্ণাটকে মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক যে ৪ শতাংশ বিশেষ কোটা দেওয়া ছিল, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া ওবিসি-র আওতায় তা তুলে দেওয়া

হয়েছে। এদের মধ্যে বীরশৈব্য লিঙ্গায়েত ও ভোকালিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে ২ শতাংশ হারে চাকরি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তির সময় তারা এই সুবিধে পাবে। উপজাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ২ ও ৪ শতাংশ যথাক্রমে কোটা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে এই অনুরোধও করেছে যাতে দলিতদের কোটার অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণও দ্রুত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বামমনস্ক দলিতদের মধ্যে দলের প্রভাব বৃদ্ধি। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা কর্ণাটকে মোটামুটি বাম ও ডান এই দু' ভাগে বিভক্ত। এখানে অত্যন্ত কঠোর স্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যতা কাজ করে দলিতদের মধ্যে। এটি বংশানুক্রমিক। বিজেপি এখন পর্যন্ত বাম মনোভাবাপন্ন দলিতদের সমর্থন পেয়ে আসছে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসপন্থী। কিন্তু কয়েকটি সম্প্রদায় 'বানজারা' সমেত যারা বামবাদী দলিতদের মধ্যে পড়ে তারা এখন বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ। মুসলমানদের কোটা তুলে দেওয়ায় দলের পক্ষে সুবিধের হচ্ছে না, কেননা সর্বোচ্চ আদালত ইতিমধ্যেই চাপা ধারণা পোষণ করছে এই কোটা বিলোপ ঠিক আইনসাপেক্ষ কিনা?

তাহলে, প্রশ্ন হচ্ছে বিজেপি কি কোনো আত্মঘাতী গোল করে বসল? অবশ্য এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ভারতখ্যাত গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল ম্যাকিং ফেডারেশন মহানন্দে কংগ্রেস ও জনতা দল (সেকুলারের)-এর হাতে একেবারে আমুলের আইসক্রিম তুলে দিয়েছে। তারা ঘোষণা করেছে তারা কর্ণাটকে সরাসরি আমুলের দুধ ও দই বিপুল পরিমাণে বিক্রি করবে। লুফে নিল বিরোধীরা এমনতরো বল। তারা দুগ্ধ সরবরাহকারকদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করেছে শুধু নয়, সফলভাবে গভীর সন্দেহ তাদের মনে জন্ম দিতে পেরেছে কর্ণাটক দুগ্ধ উৎপাদক শ্রমিকদের মনে। তারা এখন ভাবছে সরকারের নিজস্ব সংস্থা 'নন্দিনীকে' বিজেপি আমুলের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তাদের নিজস্ব গর্বের সংস্থাটির মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। এই 'নন্দিনী' ব্রান্ডই দেশের মধ্যে আমুলের ঠিক পরেই। বিজেপি বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছে যে নন্দিনীর জন্য আশঙ্কা নেই। কিন্তু বিষয়টির মূলে রয়েছে অমিত শাহ'র মান্ডিয়ায় দেওয়া বক্তব্য। এখানে তিনি বলেছেন আমুল ও নন্দিনী একসঙ্গে কাজ করবে যাতে আরও বেশি করে ছোটো ছোটো ডেয়ারি তৈরি করা যায় যেগুলি সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। তিন বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমাও তিনি দিয়ে ফেলেছেন। মনে রাখতে হবে, কর্ণাটকে দুগ্ধ উৎপাদক কৃষকরা একটি নির্বাচনী ফলাফলের ক্ষেত্রে তাদের ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে।

এখন শেষ প্রশ্নটা পড়ে থাকে তাহলে বরাবরের মতো জনতা দল (সেকুলার) কি আবার রাজা তৈরির কারিগর হয়ে উঠবে? ২০০৪ সালের পর থেকে কর্ণাটকের ভোটাররা একনাগাড়ে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা তৈরি করে আসছেন। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল ২০১৩ সালে। আর এই এতগুলি নির্বাচনী ফলাফলে জনতা (এস) বরাবর ৩০ থেকে ৪০-এর মতো মামুলি সংখ্যক বিধায়ক জিতে ২২৪ জনের বিধানসভায় অনেক ক্ষেত্রেই রাজা তৈরির জায়গায় নিজেই রাজা হয়ে বসেছে। এবারের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়ের সঙ্গেই তাদের কেমন ধোঁয়াটে সম্পর্ক। তারা দুটি জাতীয় দলেরই প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ক্ষোভ বিদ্রোহ, দলত্যাগ দেখা যাচ্ছে। তার সুযোগ নিয়ে অনেক আসনেই বিক্ষুব্ধদের নিজেদের টিকিট বিলি করছে। অবশ্য এদের প্রভাব পুরনো মহীশূর এলাকাতেই সীমিত যেখানে মোট আসন সংখ্যা ৮৯। দুটি প্রধান দলই এখন এঁদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে যা মিলন দৃশ্য হবে সবই ফল বেরোনোর পর। সকলেই তো জানে ত্রিশঙ্কু হলে এনাদের পোয়াবারো।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার পাতুলিয়া বঙ্কিম শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক স্বপন কুমার সরকার গত ১৭ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ১ পুত্র রেখে গেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। দীর্ঘদিন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

নদীয়া বিভাগ প্রচারক আশিস কুমার মণ্ডল এবং তাম্রলিপ্ত জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ কল্যাণ আশিস মণ্ডলের মাতৃদেবী আরতি মণ্ডল গত ১৬ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মঠচণ্ডীপুরের ভৈরবপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই এই এলাকায় সঙ্ঘকাজ শুরু হয়। মায়ের প্রেরণাতেই আশিস মণ্ডল প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেছেন।

আতিক আহমেদের হত্যা ও আল কায়দার হুমকি

গ্যাংস্টার ও মাফিয়া-ডন আতিক আহমদের হত্যার ঘটনায় যাঁরা আসলে গণতন্ত্রের হত্যা দেখেছিলেন, প্রথম সারির এক বাংলা দৈনিক তো এর মধ্যে যোগীরাজ্যে 'গণতন্ত্রের চেহারা' দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত। আতিক ও তার ভাই আশরাফের মৃত্যুতে তারা কল্পনা পর্যন্ত করে ফেলেছিল প্রয়াগরাজ হাসপাতাল চত্বরে পড়ে রয়েছে আসলে 'গণতন্ত্রের লাশ', ঠিক এঁদেরই জন্য একটি বিরাট খবর অপেক্ষা করে রয়েছে। আতিক আশরাফের মৃত্যুতে শুধু এঁরা অর্থাৎ ভারতীয় রাজনীতি-সংবাদমাধ্যমের 'সেকুলার' অংশের সঙ্গে আরেক পক্ষেরও এই মৃত্যুর ঘটনা প্রাণে বেজেছে। তারা হলো নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা। তবে 'সেকুলার'দের মতো এরা কেবল নিছক প্রতিবাদী হয়েই থেমে থাকেনি, পুরোপুরি হুমকির রাস্তায় হেঁটেছে। ডাক দিয়েছে 'এদেশের সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনদের শিকলমুক্ত' করার।

সম্প্রতি ইদ উপলক্ষ্যে একটি সাত পাতার পত্রিকা প্রকাশ করেছে আল কায়দার প্রচারকারী সংবাদমাধ্যম হিসেবে পরিচিত 'আস- সাহাব'। এই পত্রিকাতেই বলা হয়েছে যে 'আমরা এখনও শোষণকারীদের হাতে বন্দি রয়েছি। টেক্সাস, তিহার থেকে আদিয়ালা— আমরা সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনদের শিকলমুক্ত করব।' এই প্রতিবেদনেই আতিক-আশরাফকে শহিদ তকমাও দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৫ এপ্রিল। অপহরণের একটি মামলায় সদ্য জেলবন্দি আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফকে যখন আদালত- নির্দেশিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে সাংবাদিক সেজে তিনজন আততায়ী খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে তাদের হত্যা করে। আততায়ী গুলি করার পর পালাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আত্মসমর্পণ করে। ধরা দেওয়ার সময়ে তারা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানও দেয় আর তা নিয়েই যত সমস্যার সূত্রপাত।

এরপরেই এই ঘটনাকে ভারতীয় রাজনীতিতে সেকুলারবাদীরা হিন্দুত্ববাদের ভূত দেখতে শুরু করে, গণতন্ত্রহীনতার চিরাচরিত বুলি কপচায়। কিন্তু গ্যাংস্টার বা মাফিয়া, এটাই আতিকের একমাত্র পরিচয় নয়। সে ভারতীয় গণতন্ত্রেও অংশ নিয়েছিল। সমাজবাদী পার্টির টিকিটে পাঁচ পাঁচবার উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক ও একবার সাংসদও হয়েছিল। বর্তমানে হায়দরাবাদের আঞ্চলিক দল চরম সাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় মজলিসে-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (এআইএম আইএম)-র সঙ্গে যুক্ত।

উত্তরপ্রদেশ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের প্রতীক আতিক আহমেদ। তার বিরুদ্ধে অন্তত পক্ষে দেড়শোরও বেশি ফৌজদারি মামলা ছিল। সে রাজ্যে সমাজবাদী পার্টির আমলে তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা প্রত্যাহার করা হলেও এখনো অন্তত একশোরও বেশি মামলা ঝুলছে আতিকের বিরুদ্ধে। ভারতীয় রাজনীতিকে সে ও তার পরিবার কতটা কলুষিত করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজু পাল-উমেশ পালকে খুনের ঘটনায়। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর এলাহাবাদ পশ্চিম বিধানসভায় আতিকের ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রার্থী হয় আতিকের ভাই আশরাফ। কিন্তু উপনির্বাচনে আশরাফ হেরে যান রাজু পালের কাছে। প্রতিশোধ নিতে ২০০৫ সালের ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসের দিন খুন করা হয় রাজুকে। ওই আসনে আবার উপনির্বাচন হলে জিতে আসে আশরাফ। এই মামলার অন্যতম সাক্ষী উমেশ পালকে এবছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয়। এই হত্যায় নাম জড়ায় আতিক আহমেদের ছেলে আসাদের। কিছুদিন আগে আসাদের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারায় সে। তারপর আতিক-আশরাফের এই পরিণতি। যে কোনো মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু আরও দুর্ভাগ্যজনক সেই মৃত্যু ঘিরে রাজনীতি। আতিক- আশরাফের মৃত্যুতে তার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অন্যের জমি দখল, রাহাজানি, মহিলাদের ওপর বলাৎকার, খুন-ধর্ষণের মতো অপরাধ লঘু হয়ে যায় না। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বক্তব্য, জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আতিক-আশরাফের আততায়ীরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েছে। এর মধ্যে তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসের জুজু দেখার পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে, আল কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনের হুমকিই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও এমার্জেন্সি নম্বর থেকে প্রাণনাশেরও হুমকি পেয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এগুলো কোনোমতেই হালকা ঘটনা হিসেবে নেওয়ার নয়। নয়াদিল্লি প্রতিটি ঘটনার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে হলে যোগী আদিত্যনাথের পন্থা অবলম্বনই জরুরি। সেকুলারবাদীরা তাদের রাজনীতির স্বার্থে এই ধরনের ঘটনাকে হাতিয়ার করবে, কিন্তু সতর্ক নাগরিকের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এই সুযোগে যাতে সন্ত্রাসবাদীরা এদেশে সন্ত্রাস ছড়াতে না পারে। □

ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে হলে যোগী আদিত্যনাথের পন্থা অবলম্বনই জরুরি। সেকুলারবাদীরা তাদের রাজনীতির স্বার্থে এই ধরনের ঘটনাকে হাতিয়ার করতে চাইবে, কিন্তু সতর্ক নাগরিকের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এই সুযোগে যাতে সন্ত্রাসবাদীরা এদেশে সন্ত্রাস ছড়াতে না পারে।

আতিকদের জন্য উত্তরপ্রদেশে এক যোগী আছেন, আর আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যমে একটি বিষয়ে আলোচনা চলছে, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আততায়ীর গুলিতে বাহুবলী নেতা গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের হত্যা। পুলিশের ঘেরাটোপে আদালতে নিয়ে যাবার সময় দুই সাংবাদিকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আতিক ও তার ভাই আশরাফ। আর তাই নিয়ে দেশের মিডিয়াকুল, তথাকথিত সুশীল সমাজ, তথাকথিত রাজনীতির কুশীলবেরা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ভারতের মতো গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতার এই 'একই বৃন্তে দুটি কুসুমের' দেশে আতিকের মতো একজন সংখ্যালঘু গ্যাংস্টারের (পাঁচ বারের বিধায়ক ও এক বারের সাংসদ) এই নিষ্ঠুর হত্যা—এ তো মানবতার হত্যারই শামিল। দুর্বলের ওপর সবল সরকারি শক্তির এ কী আস্ফালন! তাই তারা এহেন হত্যাকাণ্ডের জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাপবাপান্ত করে চলেছে। আতিকের জন্য নিয়ম করে দুবেলা চোখের জলও ফেলছে। এক কংগ্রেসি নেতা তো এই মহান সমাজসেবীকে শহিদ আখ্যা দিয়ে ভারতরত্ন দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন। এসব দেখে মনে হচ্ছে আতিক নয়, এরা যেন এদের কোনো নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছে। তেলেঙ্গানার আসাদুদ্দিন ওয়েসি থেকে শুরু করে কংগ্রেস কমিউনিস্ট, সমাজবাদী মায় এই পশ্চিমবঙ্গের বেশি দুধ দেওয়া গোরুর লাথি খাওয়া দলটির হাঁড়ি-কড়া, হাফ-চামচ, সিকি-চামচ নেতারা পর্যন্ত আতিকের জন্য মড়াকান্না জুড়েছে। তাদের অভিযোগ, যোগী-মোদী জুটি এ দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের! আপনারা না বললে আমরা স্বল্পবুদ্ধির নাগরিকরা হয়তো বুঝতেই পারতাম না। বাহুবলি গ্যাংস্টার মরলে এদেশের সিন্দুকে সযত্নে চাবি দিয়ে রাখা সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। অনেকের মুখে আবার অদ্ভুত যুক্তি—আতিকের হত্যা নাকি এদেশে হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্ব (ভাইচারা) ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। একই বৃন্তের জোড়া কুসুম নাকি এতে সিঙ্গেল কুসুমে পরিণত হবে। দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এদের কাছে প্রশ্ন, তা ভাই, আতিক লোকটি কে? এতো মহান ব্যক্তিটির পরিচয়টা তো একটু দিন, শুনি। যার হত্যায় হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, তার সংবিধান বিপাকে পড়ে (যা ৭৫ বছরে মাত্র ১০৫ বার সংশোধন করা হয়েছে), তার বায়োডাটাটা একটু দেখি। জানি আপনারা দেবে না। কারণ দিতে লজ্জা করছে আপনাদের।

তবে জেনে নেওয়া যাক। এই লোকটির নাম আতিক আহমেদ। বাড়ি প্রয়াগরাজে। বাবা ফিরোজ আহমেদ ছিল হতদরিদ্র টাঙা চালক। আতিক দশ ক্লাস ফেল করার পর ১৯৮২ সালে পড়া ছেড়ে চুরি ছিনতাই শুরু করে। ধীরে ধীরে দল তৈরি করে ডাকাতি-অপহরণ- খুন- জখমে হাত পাকায়। ১৯৮৮ সালের এক সময়ে ধরা পড়ে পুলিশের জালে। এক বছর জেল খাটার পর ১৯৮৯ সালে মুক্তি পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মুসলমান অধ্যুষিত এলাহাবাদ পশ্চিম কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় প্রার্থী হয়ে জিতেও যায়। কিন্তু স্বভাব বদলায় না। বিধায়ক থাকতে থাকতেই সে চালাতে থাকে তার পুরানো অসামাজিক কাজ। ওই সময় এলাহাবাদের কুখ্যাত অপরাধী গ্যাংস্টার চাঁদবাবাকে হত্যা করে সে। তারপর ১৯৯৬ থেকে মুলায়ম সিংহ যাদবের পার্টিতে যোগ দিয়ে হয়ে যায় সমাজবাদী পার্টির নেতা। পর পর পাঁচবারের বিধায়ক আতিক ২০০৪-এ ফুলপুর লোকসভা থেকে জিতে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে। এবার সংসদ হয়ে সে চালাতে থাকে তার মাফিয়া রাজত্ব। এ যেন এক সফল গ্যাংস্টারের সমাজবাদী মার্ডারার হয়ে ওঠার রূপকথার গল্প।

> **দেশের সংবিধান, বিচারব্যবস্থা অতিকদের মনে যে ভয় সৃষ্টি করতে পারেনি, যোগী তাদের মনে সেই ভীতি জাগিয়েছেন। তিনি আমাদের মনে করিয়েছেন মহাভারতের মহাবাণী 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।'**

শুধু কি তাই? তার পুরো পরিবারের ইতিহাসও অসাধারণ। আতিক ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর আছে ১৬০টির বেশি মামলা। তার মধ্যেই অতিকেরই ১০০টি। স্ত্রী শাহেস্তা পারভীনের নামে আছে ৮টি মামলা। বর্তমানে সে ফেরার, পুলিশ তার মাথার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করে রেখেছে। বড়ো ছেলে উমর ৬টি মামলায় লখনউ জেলে বন্দি। দ্বিতীয় আলি মোহাম্মদ দুটি কেসে জেল খাটছে। তৃতীয় ছেলে আসাদ উমেশ পাল হত্যার আসামি, যে কদিন আগে পুলিশের এনকাউন্টারে মারা পড়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ছেলে নাবালক, কিন্তু বহু অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জুভেনাইল কোর্টে বিচারাধীন এবং জুভেনাইল হোমে আটক। ছোট ভাই আসরাফের বিরুদ্ধে খুন জখম অপহরণ ধর্ষণ-সহ মোট ৫৭টি কেস। ১৬ এপ্রিল আতিকের সঙ্গে সঙ্গে সেও সেদিন বেঘোরে মারা পড়েছে। তবে বুঝতেই পারছেন সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'সৎপাত্র' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন 'কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, কংস রাজার বংশধর'-এর আইডিয়াল রূপ। সুকুমারবাবু বেঁচে থাকলে আজ হয়তো তিনি আতিকের মতো মহান বংশের কাহিনি নিয়ে আর একটি কবিতা লিখে ফেলতেন।

ফঃ ২

সমাজে অপরাধ নতুন কিছু নয়। আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু সেদিন, আজকের মতো তথাকথিত ধড়িবাজ এই সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দলগুলি অপরাধীর জাত-ধর্ম দেখে তাকে নিরাপরাধ সাজিয়ে দিতো না। আজ ক্ষমতায় যেহেতু যোগী, আর মৃত একজন সংখ্যালঘু সমাজের লোক, হোক না সে কুখ্যাত মাফিয়া ও খুনি, তবুও তাকেই হিরো সাজিয়ে যোগী আদিত্যনাথের পিণ্ডি চটকাতে হবে। আতিক অপরাধী হলে কোর্ট তার বিচার করবে, শাস্তি দেবে। তার আগে পুলিশের ঘেরাটোপে আতিক হত্যা— এ হলো বিচার ব্যবস্থার চরম অপমান। ঠিকই তো, খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। কিন্তু বীরপুঙ্গবদের কাছে একটি ছোট্ট প্রশ্ন করা যেতে পারে, আতিকের বিরুদ্ধে চলা মামলাগুলি চলছে ৩০/৩৫ বছর ধরে। আমাদের দেশের আইন-বিচার ব্যবস্থা যদি এতই সর্বশক্তিমান তবে এতো বছর ধরে তার হাতে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, ধর্ষিতা হওয়া মানুষগুলি সুবিচার পায়নি কেন?

একটি ছোট্ট ঘটনাই বলে দেবে এতো বছরের সুবিচারের ইতিহাস। ২০১০ সাল। এলাহাবাদ হাইকোর্টে আতিকের জামিনের মামলার শুনানি। মামলা এসেছে বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের এজলাসে। তিনি মামলার শুনানি না করে পত্রপাঠ মামলাটি অন্য এক জজের কাছে পাঠিয়ে এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিলেন। তারপর? ২০১০ -এর ২৭ জানুয়ারি থেকে ২০১২-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর পর দশ জন বিচারপতি আতিকের জামিনের কেস নিজেরা বিচার না করে অন্য বিচারকের কাছে ট্রান্সফার করে দিয়ে গেছেন। অবশেষে এগারোতম জজ মাত্র কয়েক মিনিটের শুনানিতে আতিকের জামিন ঘোষণা করে দিয়ে চলে গেলেন অন্তঃপুরে। কয়েক মিনিটের শুনানিতে জামিন দিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এগার জন বিচারপতির দু'বছর সময় লাগে কেন এ প্রশ্নের উত্তর আছে? প্রশ্ন করুন এদেশের সর্বশক্তিমান বিচারব্যবস্থাকে, কেন সেই দশজন বিচারপতি সেই মামলা থেকে সেদিন সরে গিয়েছিলেন? এ কি আতিকের ভয়ে ,না ভক্তিতে? আসলে সেদিন তাঁরা বুঝেছিলেন যদি আতিকের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিই তবে আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাঁচা দুষ্কর হয়ে যাবে। তাই দু'বছর ধরে এক বিচারপতি থেকে অন্য বিচারপতি, তার থেকে আর এক বিচারপতি, তার থেকে আর এক.....। কেবলমাত্র বিচারপতিই বদল হয়েছে, বিচার হয়নি। তবে ভাবুন হাইকোর্টের বিচারপতিরা যেখানে অসহায় সেখানে এদেশের আইন আদালত কেমন সর্বশক্তিমান! আসলে আতিকের মতো ভয়ংকর ক্রিমিনালের কাছে তারা অসহায়। অপরদিকে আতিকের বিরুদ্ধে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে যে ১৬০জন মানুষ মামলা করেছিলেন তাঁরা কি ওই পালিয়ে যাওয়া বিচারকদের থেকেও বেশি সাহসী ছিলেন না? এছাড়াও আরও কত নির্যাতিত মানুষ, যারা আতিকদের শত অত্যাচারেও প্রাণের ভয়ে সাহস করে থানা বা আদালতের চৌকাঠ পেরোনোর সাহস করে উঠতে পারেননি, তাঁদের সংখ্যা তবে কত? আতিক আশরাফের বুকে গুলি লেগেছে বলে হঠাৎ করে এদের হৃদয় কেঁদে উঠলো, সংবিধান, আইন, বিচার ব্যবস্থার প্রতি হঠাৎ করে শ্রদ্ধা জেগে উঠলো, অথচ গত ৪০ বছর ধরে আতিকদের অত্যাচারে প্রয়াগরাজ-সহ সারা উত্তরপ্রদেশের মানুষ যখন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছিল, তখন কিন্তু এদের এই সাংবিধান, আইন-আদালত এসবের কথা একটিবারের জন্যও মনে পড়েনি। যে কাউকে তুলে এনে পেটানো, ইলেকট্রিক শক দিয়ে পাগল করে দেওয়া, হত্যা ধর্ষণ এতো কিছুর পরেও আতিক পাঁচ পাঁচবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছে, ২০০৪-এ সেই ফুলপুর থেকে সে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে। কই, তখন তো দেশের সংবিধান বিচার ব্যবস্থা তাকে আটকাতে পারেনি? জেলে বন্দি থেকেই আতিক যখন তার অপরাধের সাম্রাজ্য চালিয়ে গেছে তখন এই বিচার ব্যবস্থা তার কি শাস্তি দিতে পেরেছে? আবার যখন সে জনসমক্ষে ঘোষণা করেছে তার সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিম, লস্কর-এ-তৈবা, পাকিস্তানের আই এস আই-এর যোগ আছে তখন এই সাংবিধানিক সংস্থাগুলি কোন অজানা কারণে নিশ্চুপ ছিল? এমন এক দেশদ্রোহী ক্রিমিনালকে এরা শাস্তি দিতে পেরেছিলেন কি?

আইন ভাঙা যার কাছে ছিল খেলামাত্র সে কেমন হেলায় বার বার পৌঁছে গিয়েছে আইন তৈরির কারখানায়? বরং এই কংগ্রেস, মুলায়ম, মায়াবতী, অখিলেশ সকলেই তাকে নেতা বানিয়েছেন। কিন্তু যেই যোগী আদিত্যনাথ এলেন, আতিকদের এতদিনের অত্যাচারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে শুরু করলো, অমনি সকলের মনে পড়ে গেল এদেশে আইন, বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান বলে একটি বস্তু আছে, তাকে মানা উচিত, তাকে বাঁচানো উচিত। নষ্টামির একটা পরিসীমা থাকা উচিত। যে কাজ ৪০ বছরে কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টি-বহুজন সমাজ পার্টি, আইন-আদালত কেউ করতে পারেনি, আজ সে কাজ যোগীর সুশাসন করে দেখিয়েছে। তাতেই এত গাত্রদাহ।

২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পর উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে আইনের শাসন। অপরাধীদের মনে ঢুকেছে মৃত্যুভয়। অথচ সেই থানা, সেই পুলিশ, সেই প্রশাসন। শুধু শাসক বদলে যেতেই শাসন পালটে গেল, উলটে গেল দাবার চাল। যে পুলিশ অতিকদের দুবেলা সেলাম ঠুকতো, তাদের হয়ে তাঁবেদারি করতো সেই পুলিশ এখন অতিকদের কুকুরের মতো ছুটিয়ে ছুটিয়ে এনকাউন্টার করে মারছে। প্রশাসনের সক্রিয়তায় ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আইনের শাসন। যোগীর হুংকার 'অপরাধীওঁকো জিনে নেহি দেঙ্গে, মিট্টিমে মিলা দেঙ্গে'র রুদ্রনাদেই অপরাধীরা আজ ভীত সন্ত্রস্ত। বুকে বল ফিরে পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। অপরাধীদের যে শাস্তি এতো বছর এদেশের বিচার ব্যবস্থা দিতে পারেনি, এখন সাধারণ মানুষই সুযোগ পেলে সেই শাস্তি নিজের হাতে দিতে চাইছে। হতে পারে সে পদ্ধতি বেঠিক বা ভিন্ন। আদালতের নির্দেশেই এমন কুখ্যাত অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হলে ভালো হতো। কিন্তু ওই রামকৃষ্ণদেবের বাণী 'মাঝে মধ্যে ফোঁস করতে হয়' সে দেববাণী তো মিথ্যে হওয়ার নয়। মহাভারতে মহামতি বিদুর, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্মের মতো মহাবীরেরা পাণ্ডবদের ন্যায় পাইয়ে দিতে পারেননি। এমনকী এঁরা নিজেদের চোখের সামনে ভরা রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হতে দেখেও দুর্যোধনের ভয়ে অসহায় হয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ যেই পাঞ্চজন্যে ফুঁ দিলেন অমনি সব অন্যায়ের অবসান ঘটলো। এর অর্থ, যখন রাজা ও শাসন ব্যবস্থা উভয়েই ন্যায়বিচারে অসমর্থ হয়, তখনই হয় দেবশক্তির আবির্ভাব। এ ভারতের শাশ্বত ইতিহাস। যোগী আদিত্যনাথ সেই দেবশক্তির নবতম রূপ। দেশের সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা অতিকদের মনে যে ভয় সৃষ্টি করতে পারেনি, যোগী তাদের মনে সেই ভীতি জাগিয়েছেন। তিনি আমাদের মনে করিয়েছেন মহাভারতের মহাবাণী 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।' □

বিশ্বকর্মার সৃষ্টিকর্মের ওয়ার্কশপ এবং ভারতীয় শ্রমিক দিবস

কল্যাণ গৌতম ও সৌকালীন মাঝি

ভারতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে ১ মে'র পক্ষে 'সেকুলারি' ভোট দেবো, না সনাতনী ঐতিহ্য মোতাবেক বিশ্বকর্মা পূজায় আস্থা রাখবো — মূল আলোচনায় মনোনিবেশ করার আগে রবীন্দ্র ভাবনার তত্ত্বতলাশ নিই। কারণ 'সেকুলার বাঙ্গালি' তথা 'বামপন্থী মানস' মগজাস্ত্রে ধার দেবার আগে রবীন্দ্র স্মরণ করে নেন,''সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল....।''

'শেষের কবিতা'য় সৃষ্টি ও কারিগরির দেবতা বিশ্বকর্মার প্রসঙ্গ অবতারণা করে নান্দনিকতার একটি ঝলক দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ— '' আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিঁখুত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।''

''ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল আর তোমাকে শুধতে হবে না।''

''কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।''

লিলি অমিতকে পাখর বাড়ি তাড়না করে বললে, '' তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসাব নেই।'' রবীন্দ্রনাথের বিরোধী গোষ্ঠী বাস্তবেও যে ছিল। নিজেই তার তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন 'শেষের কবিতা'র লেখক। এখানে 'অমিট রায়' বা 'অমিট' সেই ঘরানার পাঠক এবং স্নাতক। নিবারণ চক্রবর্তী হচ্ছেন পন্থী-লেখক। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিরোধী মত হিসাবে বিশ্বকর্মাকে এক 'স্বর্গীয় স্যাকরা' হিসাবে তুলে ধরলেন। দেবতা নন, নিতান্তই এক প্রখ্যাত শ্রমজীবী। এই সূত্রে বামপন্থী শিল্পীদের দ্বারা বিশ্বকর্মা উপস্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কথা নয়। ভারতবর্ষে বসবাস করে সবসময় ভারতীয় ধারার বিরোধিতা করা যায় না, এটা এখন বুঝতে পেরেছে বামেরা। কারণ হিন্দুরাও এক সময় চটে যাবে, এই আক্কেলজ্ঞান তাদের আসছে। গত বছর একটি আর্ট কলেজে

বামপন্থী ছাত্রেরা বিশ্বকর্মার শ্রমিক সত্তাকে মেনে বিশ্বকর্মা মূর্তি গড়ে তা সংরক্ষণে অনুমোদন দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। 'রাবীন্দ্রিক সূত্র' মনে হয় এটাকেই বলে!

ভারতবর্ষের নিজস্ব শ্রমিক দিবস (Labour Day) অর্থাৎ বিশ্বকর্মাপূজা কয়েক হাজার বছরের পুরনো, কেবল শ্রমিকেরা দিনটি পালন করেন তাই নয়, প্রকৌশলী বা ইনজিনিয়াররাও পালন করেন। ফলে দিনটি ভারতবর্ষে প্রকৌশলী দিবসও বটে। শ্রমের মূল্যায়নে এবং দেব-আরাধনায় শ্রমিক-প্রকৌশলী বিচার ভারতবাসী করেনি। ভারতবর্ষে আলাদাভাবে শ্রমিক দিবস ও প্রকৌশলী দিবসের ধারণা নেই। ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাকে সমভিব্যাহারে পূজা করাটাই বিধি। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবো, নবজাগরণের কালে ভারতীয় মনীষায় 'শ্রমজীবী' সম্পর্কে ধারণা কেমন ছিল?

জানা যায়, ঊনবিংশ শতকে 'শ্রমজীবী' নিয়ে প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বদেশি মন্ত্র দিতে শিবনাথ যেমন পুরোধা ছিলেন, শ্রমজীবী মানুষকে তাতে শামিল করার ব্যাপারেও ছিলেন সমান উৎসাহী। শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। সম্পাদক ছিলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় —

" উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই!
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠো জাগো ডাকিতেছি তাই।"

সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভারতীয় ধারার মধ্যেই লালন করেছিলেন শিবনাথ। এমনকী বঙ্কিম-বিবেকানন্দও লালিত হয়েছে। তবু তাঁরা বামপন্থীদের কাছে কল্কে পাননি। কারণ তাঁরা শাশ্বত জীবনমূল্যকে অস্বীকার করতে চাননি। শাশ্বত ভাবনাকে অস্বীকার করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কীভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তা বিশ্ববাসী দেখেছেন।

১ মে শ্রমিক দিবস পালন ভারতীয় ঘরানা নয়, এটা ভারতবাসী এখন বুঝতে শুরু করেছেন। শ্রমের দেবতা বিশ্বকর্মা, আর শ্রমিক দিবস হচ্ছে ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজার দিন। 'বিশ্বকর্মা' নামের মধ্যেই আন্তর্জাতিকতার সুবাস আছে। কাজেই দিনটি কেবল ভারত কেন, বিশ্ব শ্রমিক দিবস হবার উপযুক্ত। ভারতে বিশ্বকর্মা পূজার দিনটি সরকারিভাবে শ্রমিক দিবস হোক। পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটিকে মদ-সংস্কৃতি ও অসভ্যতামির দিন করে তুলেছেন বামপন্থী শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ কনসার্ট। দিনটিকে তারা কলুষিত করেছেন। এবার তাদের ক্লোজ করতে হবে। দিনটির মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কাজটি মূলত করবেন রাষ্ট্রবাদী শ্রমশক্তি, তার পেছনে সামগ্রিক ঐতিহ্যপন্থীকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বকর্মার পূজার দিনটি ভারতীয় শ্রমিকরা কীভাবে পালন করেন? এদিন তারা আপন কর্মোন্নতির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান। বিশ্বকর্মা নির্মাতা, তিনি কর্মকার। তাদের বিশ্বাস, বিশ্বকর্মা শিল্পের দেবতা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক। তিনি হাজার বিদ্যার অধিকারী। সনাতনী সংস্কৃতিতে বিশ্বকর্মাকে বিশ্বের যাবতীয় স্থাপনার আশীর্বাদক দেবতা বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সকল কর্মের কারিগরি দেবতা তিনি, সকল যন্ত্রের যন্ত্রী-দেব, সকল প্রযুক্তির প্রকাশ-শক্তি। স্থাপত্যবেদের রচয়িতা, সর্বদর্শী ভগবান। তাঁর চোখ, মুখ,বাহু, পদযুগল সর্বদিক জুড়ে রয়েছে। তাই দিয়েই তিনি ত্রিভুবন নির্মাণ করেছেন। শিল্পকে প্রকাশ করেছেন, অলংকার সৃষ্টি করেছেন। দেবতাদের বিমান, রথ নির্মাণ করেছেন, নির্মাণ করেছেন দেবতাদের সকল অস্ত্র। তিনি দেবতাদের পুষ্পক রথ নির্মাণ করেছেন, নির্মাণ করেছেন শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, লক্ষ্মীর কোষাগার, কুবেরের পাশ, কার্তিকের বল, রাবণের লঙ্কানগরী, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং শ্রীক্ষেত্রপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ বিগ্রহ। তিনি একজন স্থাপত্যশিল্পী। দ্বারকাপুরী তাঁরই পারদর্শিতায় নির্মিত হয়েছিল, হয়েছিল দ্বারকা নগরীর বাস্তুবিদ্যার পরিকল্পনা। পৃথিবীর সকল গতির গন্তব্য-সহায়ক দেবতা তিনি। তাঁকে বিনম্র প্রণাম করে, স্মরণ-মনন করে শ্রমিকরা কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর আশিস প্রার্থনা করে দুঃসাহসিক নির্মাণকাজে ব্রতী হন তারা। কাজেই ভগবান বিশ্বকর্মার বার্ষিক আরাধনার দিনটি অর্থাৎ ভাদ্রের সংক্রান্তিটি শ্রমের পূজা, শ্রমিকের স্বীকৃতি আর শ্রমিক-দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনার দিন।

তাই বলতে হয়, আপাদমস্তক বামপন্থী সালুতে মোড়া ১ মে কোনোভাবেই ভারতে শ্রমের পরব হতে পারে না। আমাদের প্রথমে ভারতীয় হতে হবে, ভারতের সীমার মধ্যেই ভারতীয়ত্ব খোঁজ করতে হবে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে মান্যতা দিতে হবে। তারপর দুনিয়ার কমিউনিজমের সুলুকসন্ধান করতে বেরুতে হবে। তাই বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে ভারতীয় রীতি মেনে শ্রমের পূজা আর শ্রমিকের পূজা করুন। □

চীনের জনগণের কাছে ভালোবাসার আর এক নাম, মোদী লাওস্কিয়ান

নরেন্দ্র মোদীর নীতিই হল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, শুধু নিজের দেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে। তাঁর এই নীতিই বিশ্বের মানুষের মন জয় করছে।

মনীন্দ্র নাথ সাহা

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে দেউলিয়া পাকিস্তানের জনগণ বলেছেন, মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী থাকলে আমাদের অবস্থা এত খারাপ হতো না। আমরা মোদীকে চাই। এরই সূত্র ধরে বলা যায় বিশ্বমঞ্চে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা উর্ধ্বমুখী। এমনকী শত্রু দেশ পাকিস্তান কিংবা চীনেও। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকার কুটনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন 'দ্যা ডিপ্লোম্যাট' থেকে। ম্যাগাজিনটিতে লেখা হয়েছে চীনেও বিপুল জনপ্রিয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদী। শুধু তাই নয়, ম্যাগাজিনটি আরও লিখেছে—'চীনা নাগরিকরা তাঁকে ভালোবেসে 'মোদী লাওস্কিয়ান' বলে উল্লেখ করে। 'লাওস্কিয়ান' শব্দের অর্থ 'অমর'। কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত চীনা সরকারের সঙ্গে ভারতের লাগাতার বৈরিতা সত্ত্বেও সাধারণ চীনা নাগরিকদের মধ্যে মোদীর তুমুল জনপ্রিয়তা বিস্মিত করেছে আন্তর্জাতিক মহলকে।

চীনের নাগরিকরা প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক চাইলেও সেদেশের সরকার প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করায় বিশ্বাসী। যেমন—ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গতশতকের পঞ্চাশের দশকে পিকিং সফরে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুর বিশ্বাসকে আঘাত দিয়ে ১৯৬২ সালে মাও-সে-তুং ভারত আক্রমণ করেন। তখন থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরে। তার জের এখনও অব্যাহত। ২০১৯ সালে শি জিনপিঙের ভারত সফর সত্ত্বেও ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ২০ জন ভারতীয় জওয়ানের। এরই বদলা হিসেবে ভারতীয় জওয়ানরাও ৪০ জন

চীনের রাস্তায় মোদীজী

চীনা সেনাকে হত্যা করে।

'দ্য ডিপ্লোম্যাটে'র প্রতিবেদনে এক চীনা সাংবাদিক জানিয়েছেন, চীনের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ডাক নাম হল, 'মোদী লাওস্কিয়ান'। 'লাওস্কিয়ান' শব্দের অর্থ, অমর, প্রবীণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। চীনা ভাষায় প্রাজ্ঞ-র অর্থ, যে ব্যক্তির বেশ কিছু অতিন্দ্রিয় ক্ষমতাও রয়েছে। চীনা সাংবাদিকদের বক্তব্য, এমন নাম দিয়ে অন্য রাষ্ট্রনেতাদের থেকে মোদীকে হৃদয়ে আলাদা জায়গা দিয়েছেন চীনের সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, মোদীর পরিধান, চালচলনেও নাকি 'লাওস্কিয়ানে'র মিল রয়েছে। চীনের নাগরিকরা আরও বলেছেন— রাশিয়া আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে ভারতের যে গভীর বন্ধুত্ব, তা মোদীরই সৌজন্যে। এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্ভরযোগ্য ভূমিকাই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম বড়ো কারণ।

চীনের জনগণ যে শুধু মোদীকেই 'মোদী লাওস্কিয়ান' উপাধি দিলেন তা কিন্তু নয়। চীনের শাসকরা ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করলেও সেখানকার সাধারণ নাগরিকরা ভারতকে এবং ভারতের গুণীজনদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তার প্রমাণ আমরা পাই শতবর্ষ পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে। সেটিও ছিল এক অনন্য সম্মান। দেখে নেওয়া যাক সেই সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন সেখানে ভ্রমণের জন্য এবং তিনি যাচ্ছেনও। ঠিক তখনই আমন্ত্রণ পেলেন চীনদেশ থেকে। ভারতঋষি, বিশ্বকবি চীন ভ্রমণে আসছেন শুনে সেখানে শুরু হয়েছে সাজোসাজো ব্যাপার। ১৯২৪ সালে কবি পদার্পণ করলেন ঐতিহাসিক শহর পিকিঙে। সমস্ত চীনের লোক ভেঙে পড়লেন কবিকে দেখে ধন্য হতে। কবিকে দেখে মহাশ্রদ্ধায় অবনত হলো সকলের চিত্ত। কবি যখন চীনে অবস্থান করছেন, সেই সময় পড়ল কবির জন্মদিন। এলো পঁচিশে বৈশাখ। আনন্দে মেতে উঠলেন চীনবাসী।

কবি ভাবলেন—'পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই, তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই....'। তাই পরমাত্মীয়ের খোঁজ পেলেন কবি এখানেও। চীনা রীতিতেই পালন করা হলো কবিগুরুর জন্মদিন। সারাদেশ থেকে এলো শতশত উপহার। নীল পায়জামা, কমলা রঙের আলখাল্লা, আর মাথায় বেগুনি রঙের টুপি দিয়ে সাজানো হলো কবিকে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন কবি।

চীনের মানুষও তাঁদের প্রাণের ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বরেণ্য কবির জন্মদিনের উৎসবে। শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তাঁরা। তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কবির নতুন নামকরণ করে কবিকে করে নিলেন তাঁরা একান্ত আপনার, পরমাত্মীয়। সে নাম 'চু-চেন-তাং'। এ কথার অর্থ 'বজ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারতসূর্য'।

চীন ও পাকিস্তানের শাসকরা বরাবরই ভারতের ধন-সম্পদ, সম্পত্তি দখলে আগ্রহী। পাকিস্তান যেমন স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করে রেখেছে, চীনও ভারতের বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে। এ সুযোগ তারা পেয়েছে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শিতা এবং চীন-পাকিস্তানের প্রতি তাঁর নমনীয় মানসিকতার জন্য। পাকিস্তান তিনবার ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে প্রতিবারই পর্যুদস্ত হয়েছে। তবুও তাদের চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই। এখন যে দেশটা তাদের জনগণের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে না তবুও তারা ভারত বিরোধিতা থেকে সরে আসেনি। পক্ষান্তরে সে দেশের সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল। অপরদিকে নেহরুর সরলতার সুযোগ নিয়ে চীন সরকার ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে ভারতের বিপুল অংশ জবরদখল করে রেখেও তারা ভারতকে উত্যক্ত করে চলেছে। তখন থেকে এখন অবধি ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে তারা সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টায় রত। অথচ এই দুই শত্রুদেশের মানুষ কখনই চায় না প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হোক। তারই প্রমাণ 'দ্য ডিপ্লোম্যাটে'র প্রতিবেদন।

রাজনীতিতে দুর্বলতার কোনো স্থান নেই। কিন্তু নেহরু সেটাই করতেন। তারই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নেহরুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন নেহরু মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সাহায্যের জন্য এমন হীনম্মন্যতা ভরা করুণ চিঠি লিখেছিলেন তা তদানীন্তন ভারতীয় অ্যাম্বেসডার বি.কে. কাউল তাঁর লেখা বইতে উল্লেখ করেছেন। ওই চিঠি নিজে পড়ে কাউল কেঁদে ফেলেছিলেন। কেনেডি সেই চিঠির উত্তরে আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে নেহরুকে কিছু পালটা উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ''রাজনীতিতে গোবেচারা ভালমানুষি দেখানো কখনো সঠিক পথ নয়। আপনি চীনের সঙ্গে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা এবং প্রচণ্ড ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আপনি চীনাদের সঙ্গে এমন নমনীয় ব্যবহার এবং নীতি গ্রহণ করে চলেছেন যা কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষকরাই করে থাকেন। এবং অতি অল্প শিষ্যরাই তা মেনে চলতে পারেন। পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, এইসব সুবচনী শিক্ষা তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব যখন বিতর্কে বা বিবাদে দু'পক্ষই তা মেনে নিতে রাজি থাকে।'' (সি. পি. শ্রীবাস্তব : লালবাহাদুর শাস্ত্রী, পৃ. ১৬২)।

নরেন্দ্র মোদীর কল্যাণে ভারত সম্পর্কে আরও একটা খবর শুনলে আমরা বিস্মিত হবো। তা হলো এই পৃথিবীর সেরা জার্নাল আমেরিকার 'দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল'-এ সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে—'বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলটির নাম বিজেপি।' লিখেছেন ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের কলামিস্ট ওয়ালটার রাফেল বিচ নামে এক বিখ্যাত লেখক। তিনি আরও লিখেছেন, ২০১৪ সালে এই দলটি ভারতের শাসন ক্ষমতায় এসেছে। পরে ২০১৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং আগামী ২০২৪ সালেও ক্ষমতায় আসতে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন, চাইনিজ পাওয়ার যা আমেরিকা প্রতিহত করতে চায় তা ভারতের সাহায্য ছাড়া, বিজেপি সরকারের সাহায্য ছাড়া সেটা আমেরিকা কোনোদিন করতে পারবে না।

অনেকেই মনে করেন, নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার আরও একটা বড়ো কারণ, প্রতিপক্ষকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। যেমন পাকিস্তানের পোষিত জঙ্গিরা ভারতীয় সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়ে ৪০ জন সেনা হত্যার বদলা হিসেবে ভারত জবাব দিয়েছিল পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়ে প্রায় ৩০০ জঙ্গিসহ পাকিস্তানি সেনা খতম করে। তেমনি চীনকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল গালওয়ানে ভারতের ২০ জওয়ানের মৃত্যুর পালটা ৪০-এর বেশি চীনা জওয়ানকে খতম করে। কথায় বলে প্রতিপক্ষরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। চীন-পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেদেশের সরকার তা মানে না। পক্ষান্তরে নরেন্দ্র মোদীর নীতিই হল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, শুধু নিজের দেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে। তাঁর এই নীতিই বিশ্বের মানুষের মন জয় করছে। □

দেশের আর্থিক উন্নয়ন বিশ্বায়নের হাত ধরেই

তারক সাহা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ঘোষণা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তার একটি উদাহরণ পাওয়া গেছে এক সংবাদের মাধ্যমে। সদ্য সমাপ্ত আর্থিক বছরে দেশ থেকে শুধু মোবাইল ফোন বিদেশে রপ্তানি হয়েছে তার আর্থিকমূল্য ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই রপ্তানির আর্থিক মূল্য সরকারি লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। শ্লাঘার বিষয় হলো, মোবাইল ফোনের ঘরোয়া এই উৎপাদন চীনা কোম্পানির ঘরোয়া বাজারে যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তার একেবারে ৭৫ শতাংশ কমিয়ে ফেলা গেছে। এই রপ্তানির সিংহভাগ করেছে 'অ্যাপেল' নামের কোম্পানিটি, আর সামসাং করেছে বিলিয়ন ডলার। টাকার অঙ্কে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। আত্মনির্ভর ভারত থেকে গত আর্থিক বছরে একলক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকার যে ইলেকট্রনিক পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য হয়েছে তাতে স্মার্টফোনের বাণিজ্য বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশের ওপরে।

প্রযুক্তি শিল্পের এত বৃদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু দেশ অন্যান্য নির্মাণ শিল্পে (Manufacturing Industry) অতটা উন্নয়ন করতে পারেনি। জেপি মর্গান নামে ভারতীয় এক আর্থিক সংস্থা এক সমীক্ষায় বলেছে যে, আগামী বছরগুলোতে দেশ পরিষেবামূলক (Service Sector) শিল্পে প্রভূত উন্নতি করবে। প্রাক অতিমারি কালে প্রতি মাসে পরিষেবা দেশ রপ্তানি করেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা এবং করোনা পরবর্তীকালে এই রপ্তানি লাফিয়ে বেড়েছে প্রায় পঁচাশি হাজার কোটি টাকার বেশি ২০২১-২২ অর্থ বছরের শেষ মাসে।

মূলত দেশের উৎপাদন শিল্প দুটি ভাগে বিভক্ত। এক, বস্ত্র, বিভিন্ন ধাতু শিল্প, চর্ম, রসায়ন-সহ কম্পিউটার, সার প্রভৃতি শিল্প এবং দুই, সফটওয়্যার, গবেষণা ও পরামর্শ (Consultancy)-র মতো ক্ষেত্রগুলি পরিষেবা অঞ্চলে অবস্থিত।

বিগত বছরগুলিতে উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধি প্রবলভাবে ব্যাহত হলেও পরিষেবামূলক শিল্প দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর হাত ধরেই একদা অন্য দেশগুলিকে অর্থনীতিতে পেছনে ফেলে দুনিয়াতে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে ভারত, এটা কম গৌরবের নয়। দেশের বৃহৎ আইটি সংস্থাগুলো দেশের আর্থিক উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা পালন করছে। করোনা পরবর্তী দুনিয়াতে পরিষেবামূলক শিল্প ধারাবাহিক ভাবে তাদের উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। ছোটো কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ, গবেষণা প্রভৃতি কাজ করে চলেছে।

অন্য আরেকটি সংস্থা এইচএসবিস বলেছে যে, ডেটা অ্যানালিটিক সেক্টরে ভারত অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে এবং দেশের আইটি কোম্পানিগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ওষুধ, শিক্ষা, আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবে অনেক দক্ষ ভারতীয় নিযুক্ত। কেবল দেশ যে পরিষেবা শিল্পে উন্নত এমন নয়, উৎপাদন শিল্প তথা পরিবহণ-সহ ভেষজ শিল্পে যথেষ্ট উন্নত। বিশেষত দু-চাকার গাড়ি উৎপাদনে ও রপ্তানিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে দেশ।

দেশের বৃহৎ সমস্যা কর্ম সংস্থান। বেশি মাত্রায় যুবক-যুবতীদের হাতে কাজের জোগান। সম্প্রতি সরকার এক যোজনা নিয়েছে যে, আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রতি মাসে একলক্ষ নিয়োগপত্র দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে রেল একটা বৃহৎ ক্ষেত্র। বিরোধী দল কেন্দ্রীয় যোজনাকে নির্বাচনী গিমিক বলতেই পারে, কিন্তু এই পরিযোজনা সফল হলে আগামী এক বছরে বারো লক্ষ যুবক- যুবতীর হাতে কাজ পৌঁছে যাবে। দেশে এখন প্রয়োজন কাজ তৈরির জন্য বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহিত করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেও উৎসাহ প্রদান করা। অতীতে দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের বুনিয়াদ হলেও সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিকাঠামোয় সরকারি লগ্নি বৃদ্ধি। চলতি আর্থিক বছরে সরকারের সিদ্ধান্ত হলো পরিকাঠামোয় সরকার ব্যয় করবে দশ লক্ষ কোটি টাকা যা জিডিপির সাড়ে পাঁচ শতাংশ। বিজেপি শাসিত রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দেশের আর্থিক উন্নয়নে পাখির চোখ করেছে পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে। অটলজীর সরকার দু' হাজার সালে সোনালি চতুর্ভুজের মাধ্যমে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল ভারতের গ্রামগুলিকে জুড়তে নরেন্দ্র মোদী তাকে আরও পরিশীলিত রূপ দিয়েছেন পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে। এতে যেমন কর্ম সংস্থান হবে তেমনি ভালো রাস্তা, সেতু, বন্দর, রেল ইত্যাদি পরিকাঠামো বৃদ্ধি হলে বাইরের লগ্নিকারীরা উৎসাহিত হবেন এ দেশে লগ্নি করতে।

দেশে বেশি বেতনের প্রশিক্ষিত কর্মীর জোগান বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে দেশের চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি অল্প মেধা, অদক্ষ কর্মীদের হাতে কাজের সুযোগ বাড়বে। তেমন আমাদের দেশের প্রশিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের অনেকেই আইটি সেক্টরে কাজ করে ভালো রোজগার করে। এরা অনেকেই গাড়ি চড়ে, এদের অধিকাংশই নিম্ন বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, কিন্তু অনেকেই গাড়ি ব্যবহার করে বলে গাড়িচালকের প্রয়োজন হয়, এখানেই কিছু কাজের সুযোগ বাড়ে। কিংবা বাড়িতে কাজের লোকের চাহিদা বাড়ে। এইভাবে কিছু কাজের সুযোগ বাড়ে।

ভারত এই মুহূর্তে জি-২০ সভাপতি। এই সুযোগ কাজে লাগাক ভারত। যেসব অচিরাচরিত কিছু ক্ষেত্র যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত অভিজ্ঞ মানুষের পরিষেবা ব্যাপক হারে রপ্তানি করতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের সুবাদে এখানকার অনেকেই ইংরেজি ভাষায় দক্ষ। এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা হতে পারে। ভারতে অনেক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার আছেন যাদের সুচিকিৎসা বিদেশে অনেকেই উপকৃত হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো ব্রিটেনে ভারতীয় ডাক্তারদের ডিগ্রি স্বীকৃত নয়। ভারত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সারা দুনিয়ায় ভারতীয় ডাক্তারদের ডিগ্রির স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করুক। এইভাবে দেশ বিশ্বায়নের লাভ তুলতে পারবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কিছু প্রশ্ন

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। পরের বছর নির্ধারিত ওইদিনে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালন করে। মাতৃভাষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে একটি জাতির মরণপণ সংগ্রামের ইতিহাস— ভাষার ও স্বাভিমানের। ক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তান। ফ্ল্যাশব্যাকে একটু অতীতচারী হওয়া যাক।

১৯৪৭-এর ১৯ মে মুসলিম লিগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান যখন ঘোষণা করেছিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ খুব একটা প্রতিবাদী হননি। কারণ মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান সৃষ্টির যে দাবি উঠেছিল তাতে এ আশাই ব্যক্ত হয়েছিল, পাকিস্তান কায়েম হলে মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার সুবিধা হবে।

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারির করাচিতে। এ অধিবেশনের আগে পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটিকে উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানে শাসকরা খারিজ করলেও মাতৃভাষা বাংলার স্বপক্ষে ধীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির এই মহান মানুষটিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকেরা প্রচার করলেন বাংলা বর্ণমালা হিন্দু বর্ণমালা দেবনাগরী থেকে জাত বলে তা কাফের স্থানীয়। অতএব পরিত্যজ্য। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের বেশকিছু লেখক বুদ্ধিজীবীকে নিজেদের মতভুক্ত করলেন। প্রথম পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি ১৯৫২-র জানুয়ারিতে ঢাকায় এসে পল্টনের ময়দানে জিন্নার কথাকে দৃঢ়স্বরে সমর্থন করে বলেন যে, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদী হলো বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তান। ৩০ জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দেয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ভাষা কমিটি'। তীব্র হলো সংঘাত। ২১ ফেব্রুয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে খানসেনার গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন, কৃষক আব্দুল জব্বর, ব্যাংককর্মী আবদুস সালাম। অন্তত আরও দুজন অজ্ঞাতনামা প্রাণ হারিয়েছিলেন। কবি শামসুর রহমান বেদনাহত হৃদয়ে লিখলেন— 'উনিশ শো বাহান্নর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি/ সগৌরবে বুকে নিয়ে আছ মহীয়সী।'

ভাষার জন্য এই আত্মবলিদান নিঃসন্দেহে গর্বের এবং বহুচর্চিত। আন্তর্জাতিক স্তরে অভিনন্দিত। কিন্তু এর পরেই একটি প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলা ভাষার স্বাভিমান রক্ষার জন্য শুধুমাত্র সালাম, বরকতদের নাম উচ্চারিত হয় কেন। কেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো অসমসাহসী, নির্লোভ, নৃশংসভাবে সপুত্র খুন হওয়া মানুষটি অনেক কম উচ্চারিত হন?

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না ১৯৬১-র বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলন। ১৯৬০-এর ২২ এপ্রিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস অসমীয়কে একমাত্র রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি হিসেবে প্রস্তাব নেয় এবং ২২ অক্টোবর প্রবল প্রতিবাদের মধ্যেও বিধান সভায় তা 'রাজ্যিক ভাষা বিল' আইনে রূপান্তরিত হয়। বরাক নদীর জলে পুষ্ট কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকায় তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলন অহিংস থাকলেও ১৯৬১-র ১৮ মে অসমের কংগ্রেস সরকার প্রবল অত্যাচার শুরু করে। ১৯ মে বরাক উপত্যাকায় অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সবকিছু অচল হয়ে যায়। বরাকের প্রধান শহর শিলচরে আন্দোলনের জন্য ট্রেন বন্ধ থাকে। বেলা ২টায় ঘটে সেই ভয়াবহ ঘটনা। কাটিগর থানা থেকে হাতকড়া পরানো ভাষা আন্দোলনকারীদের যে ট্রাকে আনা হচ্ছিল তা লেভেল ক্রসিং-এ আটকে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকারীরা সম মনোভাবের শিকলবন্দি আন্দোলনকারীদের মুক্ত করার জন্য যখন সক্রিয় হন, তখন হঠাৎ সেই ট্রেনে আগুন লাগে। ভাষা সত্যাগ্রহীদের চেষ্টায় যখন তা নেভানোর চেষ্টা করা হয় তখন পুলিশ হিংস্র উন্মত্ততায় গুলি বর্ষণ করলে নিহত হন এগারো জন। আহত বহু। ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রাণদান করা একাদশ। হলেন—

১। কমলা ভট্টাচার্য, ২। সুকোমল পুরকায়স্থ, ৩। কুমুদ দাস, ৪। বীরেন্দ্র সূত্রধর, ৫। এক রেলওয়ে কর্মী, ৬। সুনীল সরকার, ৭। সত্যেন্দ্র দেব, ৮। হিতেশ বিশ্বাস, ৯। চণ্ডীচরণ সূত্রধর, ১০। তরুণী দেবনাথ, ১১। শচীন্দ্র পাল।

সবাই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কোমর থেকে বুকের মধ্যে এবং সামনের দিক থেকে। কেউ পালিয়ে যাননি। যেতে চানওনি। কিন্তু আ-মরি বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন, বলিদান ব্যর্থ হয়নি। বরাক উপত্যকায় বাংলা তার মর্যাদাময় স্বীকৃতি আদায় করেছে।

বাংলা ভাষার জন্য সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও তার সামান্য কিছু পরে অসমে সংগঠিত হয়েছিল তীব্র আন্দোলন। শাসকের গুলিবর্ষণে মৃতের সংখ্যাও একদিনে সর্বোচ্চ ছিল বরাক উপত্যকায়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষীরা ছিলেন বিপুল সংখ্যায়। রাজাকার ছাড়া সীমাহীন জনতার সমর্থন ছিল তাঁদের সঙ্গে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় ছিল অনেক কম সংখ্যায় বাঙ্গালি। আ-বিশ্ব বাংলা ভাষীদের মাত্র দেড় শতাংশ বাস করতেন সেখানে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো এগারো জন বলিদানী অনুষঙ্গ হিসেবেই উঠে আসেন। ভাষা আন্দোলনের রাজাধিরাজের খ্যাতি আসে না তাঁদের। জব্বর, বরকত, সালামরা যত আলোচিত, দ্যুতির বন্যায় প্লাবিত, তাঁর কণামাত্র আলোর টুকরোও এদের কপালে জোটেনি! □

ভারতীয় মুসলমানরা মুঘলদের বংশধর নন

বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ যথার্থই বলেছেন, ভারতের মুসলমানরা মুঘলদের বংশধর নন। কারণ মুঘল ও আফগান আক্রমণকারীরা কেউই নিজেদের জেনানাদের সঙ্গে করে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেনি। তারা ভারতের বিভিন্ন অংশ দখল করে সেখানকার হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে, হত্যা করে এবং অন্যান্যদের ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করে, তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ক্রমাগত। সব থেকে বেশি অত্যাচারিত, নির্যাতিত হতে বাধ্য হয়েছিল রাজপুতরা। পুরুষদের অধিকাংশই রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়েছিলেন। অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা ধর্মান্তরিতা হতে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন যারা জহরব্রত করে নিজেদের জীবন। উৎসর্গ করতে পারেননি। চিতোরের রানি পদ্মিনীও আলাউদ্দিনের লালসা থেকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে জহর ব্রত করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

মুঘল বাদশাহদের অনেকেই নাকি রাজপুত মহিলাদের গর্ভজাত সন্তান। মুঘল বাদশাহ আকবরের পরাজিত নৃপতিদের সঙ্গে সন্ধির অন্যতম শর্তই ছিল পরাজিত নৃপতির স্ত্রী, কন্যা অথবা ভগিনী কাউকে তার হারেমে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। আকবরের সেনাপতি মানসিংহও বাধ্য হয়েছিলেন নিজের ভগিনী যোধাবাঈকে আকবরের হারেমে পাঠাতে। কিন্তু সেটা প্রেমকাহিনি বলে চালানো হয়।

এরপর ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত মুসলমান শাসকদের কবজায় চলে গেলে হিন্দুরা ক্রমাগত অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে কেউ কেউ ইসলাম কবুল করতে থাকে। ফলে দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান (!) মুঘল বাদশাহ আকবর হিন্দুদের ফাঁদে ফেলার জন্য দীন ইলাহি নামে একটি ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। কোনও মুসলমান ওই ধর্ম কবুল করতে এলে আকবর তাকে তিরস্কার করতেন। তাছাড়া হিন্দুরা জিজিয়া করের হাত থেকে রেহাই পেতেও অনেক হিন্দু ইসলাম কবুল করেছিল। এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা এদেশে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের মধ্যে মুঘল রক্ত বহনকারী মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্যই বলা যেতে পারে।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

সব ধরনের সমস্যার মূল হলো দুর্নীতি

পৃথিবীর সবচেয়ে বৈভবশালী, সমৃদ্ধিশালী, ঈশ্বরের অতি প্রিয় দেশ, প্রিয় ভূমি আমাদের ভারতবর্ষ। ৮০০ বছরের পাঠান-মুঘল ও ২০০ বছরের ইংরেজ শাসন। তারপর ৭৫ বছর দেশের রাজনৈতিক নেতা, আমলা, পুঁজিপতি, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দেশের সম্পদ লুঠ করেও শেষ করতে পারেনি। অথচ এই দেশের মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। দারিদ্র্যের জ্বালায় ছটফট করে। বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে শিশুরা শ্রমিকের কাজ করে।

অন্যদিকে আপনার জমি, বাড়ি, দোকান, সম্পত্তি জোর করে দখল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মা-বোনদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে খুন করে দিচ্ছে। পুলিশ, আদালত, কোথায় যাবেন? কবে বিচার পাবেন? অথচ মানুষরূপী অসুর, রাক্ষস, যারা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ লুণ্ঠন করেছে, তাদের বাঁচাবার জন্য হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে কিছু উকিল কাজ করছেন। এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধানে একদিকে যেমন সামাজিক সংস্কার, নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষার জাগরণের দরকার, অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্ত হাতে অপরাধীকে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি প্রয়োজন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর কোনো সন্ন্যাসী রাজা সরকারি ব্যবস্থা দ্বারা সেই আসুরিক শক্তিকে আঘাত করতে চাইছেন। শাস্তি দিতে চাইছেন। ঈশ্বরের দূত হিসেবে এক বঙ্গসন্তান এক আদর্শ বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। তখন আমরা সাধারণ মানুষ তাঁদের পাশে থাকবো না? সাধারণ মানুষের উদাসীনতার জন্য সেদিন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। আজ আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য আমরা পালন করবো না? জাতি, ধর্ম, রাজনীতি, মতবাদ সব কিছু ভুলে আমরা শুভশক্তির পাশে থাকবো নিজের ভবিষ্যতের জন্য। না হলে ভবিষ্যতে রাক্ষসদের হাত থেকে আমাদের কেউ বাঁচতে আসবে না।

—**ডাঃ নীলমাধব ব্যানার্জি,**
দুর্গাপুর।

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে পারে বিচারব্যবস্থাই

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক প্রকৃতির। রাজনীতিক ক্ষমতার সঙ্গে বল প্রয়োগের উপাদান ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। The Vocabulary of politics শীর্ষক গ্রন্থে ওয়েলডন লিখেছেন যে অধিকাংশ মানুষ যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয়, তাহলে নিকৃষ্ট কর্তৃত্বের সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অনিষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ওয়েলডন হিটলারের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে টাকা ওড়ে খোলামকুচির মতো। হাসপাতালে আয়ারাজ, দালাল চক্র। রক্ত পেতে গেলে দিতে হয় ঘুষ। প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিকে বেআইনি লেন-দেন। টাকা দিলে আগাম মেলে

ফঃ ৩

প্রশ্নপত্র। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিঙে ভর্তিতে ব্যাপক কেলেঙ্কারি, শুধু টাকা। সর্বক্ষেত্রে চাই শুধু টাকা। ৪ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ। পরীক্ষায় না বসেও দুয়ারে নিয়োগ পত্র।

প্রমোটারের কারবার জমি, বাড়ির পাশাপাশি চাকরি। সদ্য ধৃত অয়ন শীলের ব্যবসার ভিত্তিটা হলো চাকরি কেনা-বেচা। তার অ্যাকাউন্টে ৫০ কোটির লেন-দেন। কোটি কোটি টাকা উড়ছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন শীল— চাকরি, কয়লা, বালি পাচারে টাকা উড়েই চলেছে। সারদা, রোজভ্যালির বিচারাধীনে অনেকে গেল। গোরু পাচারের তদন্তেও কয়েকশো কোটি টাকার কারবারের হদিস মিলছে। অন্তত ইডি, সিবিআইয়ের তাই দাবি। বেনামি অ্যাকাউন্ট। এক নামে হাজার হাজার কোটির গল্প। যেন সমান্তরাল অর্থনীতি। কলঙ্কের সীমা নেই। অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলের ভেতরে। এসব ক্ষেত্রে আইন-আদালতই করতে পারে ন্যায়বিচার বা সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।

মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান বিচার ব্যবস্থা। সেই বিচার ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন গুনছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। পশ্চিমবঙ্গে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষেরও কম। এটা প্রমাণ করে, পশ্চিমবঙ্গের অধঃপতন। এই অধঃপতন থেকে রক্ষার করার দলমত নির্বিশেষে এক জোট হওয়া। মানুষের মনুষত্ব রক্ষায় 'গণতন্ত্র রক্ষায়' বিচার ব্যবস্থাই পথ প্রদর্শক, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

জয় শ্রীরাম-ধ্বনি

রামনবমী উপলক্ষ্যে গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে এ রাজ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তদের শোভাযাত্রা হয়েছে। পশ্চিবঙ্গের আকাশ বাতাস জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। এই জয় শ্রীরাম স্লোগান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি নাকি বাঙ্গালির সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত নয়। কারণ রাম বাঙ্গলার আরাধ্য দেবতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করেন না। এই রাজ্যে মূলত মাতৃকাশক্তির পুজো হয়ে থাকে। দুর্গা, কালী ইত্যাদির পুজো তাদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। এছাড়া বাঙ্গলার লোকেরা সাধারণত খুব কম ক্ষেত্রেই 'জয় সীতারাম' বলে থাকেন। পার্শ্ববর্তী বিহারে 'রাম রাম' অথবা 'জয় সিয়ারাম' ডাকের প্রচলন আছে ঠিকই তবে সেখানেও খুব একটা 'জয় শ্রীরাম' শব্দবন্ধের ব্যবহার হয় না।' অতএব, তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাঙ্গলার নিজস্ব ভাষ্য নয়। এই ভাষ্য বিজেপিই উত্তর ভারত থেকে বাঙ্গলায় আমদানি করে এনেছে।

আসলে বাম আমলে থেকে সংখ্যালঘু তোষণ যত বেড়েছে ততই হিন্দু ভাই-বোনেদের অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছে। তারা তাই রাম নামের স্মরণাপন্ন হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে 'মেল্টিং পট থিয়োরি' নামে একখান তত্ত্ব প্রচলিত আছে যার মোদ্দা বক্তব্যটি হলো, কোনো সমাজই একমাত্রিক একক পরিচিতি বহন করে না। একটি সমাজ বহুমাত্রিক এবং তার সাংস্কৃতিক পরিচয়টিও বহুত্ববাদী এবং এই বহুত্ববাদ নিজে এক স্বতন্ত্র পরিচিতির নির্মাণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকে বাম জমানা শেষ পর্যন্ত যারা এই রাজ্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাদের অধিকাংশটাই ছিলেন উচ্চবিত্ত এবং হিন্দু। আরও সহজ করে বললে, গোটা সিপিএম পার্টিটাই এক প্রকার বামুন-কায়েতের পার্টি হয়ে উঠেছিল। তাদের বেশিরভাগটাই ছিল শিক্ষিত এবং এলিট। বাম জমানায় মানুষের জাতিগত ভাবনা এবং মানসিকতাগুলি সেরকম প্রকাশ পায়নি এর মানে এটাও নয় যে তা তখন ছিল না। দলতন্ত্রের কারণেই হোক বা মানুষের মানসিকতা ভালো থাকার কারণেই হোক তা বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা গেছিল। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হচ্ছিল অন্যত্র। এই রাজ্যে বাম জমানায় একজন ব্যক্তি খুব সহজেই একসঙ্গে একজন কমিউনিস্ট ও একজন হিন্দু অথবা একজন কমিউনিস্ট ও একজন মুসলমান— এই দুইপ্রকার আত্মপরিচয় বহন করতে পারত। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে, সমাজের নীচু স্তরে ব্যাপারটি এতখানি সরলরৈখিক ছিল না। সিপিএমের প্রবল সমর্থক হয়েও সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি হয় হিন্দু ছিল অথবা মুসলমান। এই আত্মপরিচিতির বিভাজনটি দীর্ঘদিন ধরে চাপা ছিল।

এর আগে এই রাজ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি যে তৈরি হয়নি এমন নয়! স্থানে-অস্থানে ছোটো-খাটো মাপের হলেও বেশ ভালোরকম দাঙ্গার নজির ছিল। সরকার পুলিশকে দিয়ে এইসব দাঙ্গাগুলি থামিয়ে দিত ঠিকই কিন্তু মনের ছাইচাপা আগুন তাতে নেভানো যায়নি। এই রাজ্যের হিন্দুদের একটি দীর্ঘদিনের অভিযোগ হলো, সিপিএম তাদের ৩৪ বছরের শাসনকালে সংখ্যালঘু তোষণ ভিন্ন আর কিছুই করেনি। ফলে হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করেছে। তৃণমূলের আমলে এই প্রতারণা সমস্তরকমের মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে। আজ সেই সংখ্যাগুরুরা অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ সেই অবহেলার প্রতিশোধ চাইছে। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তাই আজ যতখানি ধর্মীয় ব্যাপার, তার থেকেও অনেক বেশি প্রতিবাদের স্লোগান, প্রতিরোধের বিষয়। অনেকের এতে মনে হতেই পারে, এই শব্দ পশ্চিবঙ্গের নিজস্ব কোনো পারিভাষিক শব্দ নয়। অনেকেই ভাবতে পারেন উত্তর ভারতের সংস্কৃতি বাঙ্গলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেল বুঝি। আসলে হিন্দুরা জোটবদ্ধ হচ্ছেন, তাই তোষণ রাজনীতির বিরুদ্ধে স্লোগান জয়শ্রীরাম। সম্প্রতি হাওড়া, রিষড়া ও ডালখোলায় রাম ভক্তদের উপরে আক্রমণ ঘটানো হলো। আসলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে শাসকদল আতঙ্কিত, তারা সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিজেদের আস্থা ফেরানোর জন্য জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে শোভাযাত্রা আক্রমণ করেছে এবং দোষীদের আড়াল করছেন।

তাই হিন্দু সমাজের কাছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুধু ভগবান রামচন্দ্রের জয়গান নয় বরং বর্তমান সরকারের সমস্ত রকম দুর্নীতি ও তোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ধ্বনি।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

চাই মানসিকতার পরিবর্তন

শবরী ঘোষ

শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনীতি, সেনাবাহিনী, মহাকাশ অভিযান অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় মেয়েদের অবাধ পদচারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো আমাদের সমাজে বহু মানুষ মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী পূজিত হন মাতৃশক্তিরূপে। কিন্তু 'মেয়েরা মায়ের জাত' এবং 'মেয়েদের কাজ হলো কেবলমাত্র বংশরক্ষার জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাদের মানুষ করা'— এই দুটি ধারণা নিশ্চয়ই এক নয়।

অশিক্ষিত পরিবারগুলির একটি বৃহৎ অংশ মেয়েদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার মেশিন মাত্র মনে করে। আমার সহকর্মী বিজ্ঞানের এক অধ্যাপক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, 'মেয়েদের জন্ম হয়েছে তো এই জন্যই যাতে তারা ভবিষ্যতে সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশবিস্তারে আমাদের সহায়তা করতে পারে।' অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিলাম শুনে যে, তিরিশের কোঠায় না পৌঁছনো ওই সহকর্মীর তথাকথিত শিক্ষিত মা-ও ছেলের এই চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করেন। মেয়েরা নিজেরাই যদি এধরনের ধ্যানধারণা পোষণ করে তবে ছেলেদের আমরা কী দোষ দেব? এখনো অনেক পরিবারে কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত। কন্যাভ্রূণ হত্যার পরিসংখ্যান দিনে দিনে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৯৪০ জন। ভারতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় সাড়ে তিন কোটি কম। এই হার বজায় থাকলে আগামী ১৫ বছর পরে অন্তত দু'কোটি ভারতীয় পুরুষ বিবাহ করার জন্য মেয়ে খুঁজে পাবেন না। আর কন্যাসন্তান না থাকলে ভবিষ্যতে 'মাতৃত্ব' শব্দটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

অনেক পরিবারেই পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে তীব্র ভেদাভেদ করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য বরাদ্দ হয় পুত্রসন্তানটির জন্য আর বাড়ির পুরুষদের সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট পড়ে থাকা খাদ্য জোটে মেয়েদের ভাগ্যে। আমি নিজে দেখেছি যে, বহু ক্ষেত্রে মায়েরা নিজেরাই পুত্র ও কন্যার মধ্যে তফাত করেন। পুত্রের উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তিত বহু মা'কে বলতে শুনেছি যে, 'মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে অত বেশি ভাবি না। ওর বিয়েটাই কেবল চিন্তার বিষয়।' অনেক মেধাবী বান্ধবীর উচ্চশিক্ষা লাভ করার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে এই জন্য যে, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা মনে করতেন যে, 'যে মেয়ে ভবিষ্যতে পরের ঘরে চলে যাবে তার জন্য ফালতু খরচ করা কী দরকার। বরং ছেলে ঘরে থাকবে, ভবিষ্যতে আমাদের দেখবে তার পড়াশোনার জন্যই টাকা ঢালা উচিত।'

সংসার প্রতিপালনের জন্য অথবা নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে অনেক মেয়েই চাকুরি করেন। কোনো কারণে কর্মক্ষেত্রে থেকে বাড়ি ফিরতে যদি মেয়েটির দেরি হয়, তখন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের তির্যক চাহনি ও কটু মন্তব্য তাদের সহ্য করতে হয়। সবথেকে অবাক লাগে, ওই মেয়েটির চরিত্র সম্পর্কে যাঁরা এধরনের মন্তব্য করছেন তাদের সিংহভাগই আবার মহিলা। আমার পরিচিত এক অধ্যাপকের মা একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার ছেলের কর্মরতা মেয়ে ছাড়া বিয়েই দেব না। তবে যে-সে চাকুরি হলে চলবে না। স্কুলটিচার বা কলেজের প্রফেসরই চাই। অন্য চাকুরি করতে গেলে মেয়েদের চরিত্র ঠিক থাকে না।'

যেখানে ভারত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলে একজন খেলোয়াড়ের বান্ধবীকে দায়ী করা হয় এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর সম্পর্কে অপভাষার ঝড় তোলে সেই দেশে মেয়েদের উন্নতি কীভাবে হবে? মেয়েদের উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং তাদের সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সবার আগে মেয়েদের উচিত নিজেদের নারী হিসাবে সম্মান করতে শেখা। তারা যদি নিজেদের কেবলমাত্র সংসারের বিনা মাইনের দাসী বা সন্তানের জন্মদাত্রী মেশিন মনে করার পরিবর্তে সংসার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক বলে মনে করে তাহলে পুরুষদের মানসিকতাতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কেউ যদি নিজেকে সম্মান করতে না শেখে তবে সে অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভ করবে কী করে? পোশাক-আশাক বা ভাষাবিপ্লবের চেয়েও মানসিকতায় যদি পরিবর্তন আনা যায় সেটাই কিন্তু হবে প্রকৃত বিপ্লব। □

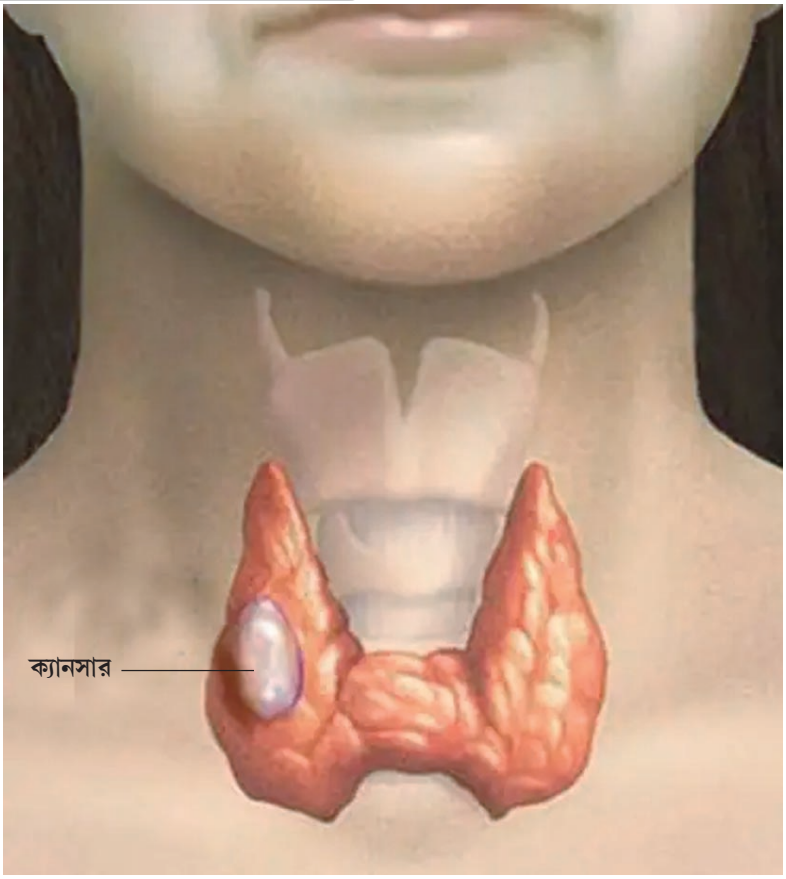

থাইরয়েড ক্যানসার সারিয়ে তুলছে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হোমিওপ্যাথিতে থাইরয়েড ক্যানসারের রয়েছে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত চিকিৎসা। যাতে কোনো অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় দেখা গেছে থাইরয়েড অপারেশন করালেও কিছুদিন পর আবার ফিরে এসেছে। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে বার বার অপারেশন করা যায় না। তাই প্রথমেই যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা যায় তাহলে রোগী অনেকটাই সুস্থতার পথে এগিয়ে যাবে। ভারী চেহারার মানুষদের অনেককেই বলতে শোনা যায়, তাঁদের থাইরয়েডের অসুখ আছে। থাইরয়েডের অসুখের মধ্যে মূলত দু'ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। প্রথমত, কম হরমোন নিঃসরণ হওয়া বা হাইপো-থাইরয়েডিজিমের জন্যে বিপাকীয় হার কমে যাওয়ায় ওজন বাড়তে থাকে। আর দ্বিতীয়ত, হাইপার- থাইরয়েডিজিম। এই অসুখে হরমোন নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে থাইরয়েড গ্রন্থিতে ক্যান্সারযুক্ত টিউমারের মতো অসুখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চটপট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করে দিন।

কী কী উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন

থাইরয়েড ক্যানসারের নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু জানতে পারেননি। তবে কিছু উপসর্গ দেখলে সতর্কতা হিসেবে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

● একটা মুশকিল হলো থাইরয়েড গ্রন্থিতে ক্যানসার হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম দিকে কোনো উল্লেখযোগ্য উপসর্গ থাকে না। তবে গলকণ্ঠ ফোলা লাগতে পারে। আসলে প্রজাপতির আকৃতির থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় থাকে, এখানে ছোটো লাম্প হলেও বাইরে থেকে তা পরিষ্কার দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো উচিত।

● গলার স্বর বদলে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গলা ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যায়।

● ঢোক গিলতে অসুবিধে হয়। বিশেষ করে খাবার খাওয়ার সময় গিলতে খুব কষ্ট হয়।

● গলা ও ঘাড় লাগোয়া লসিকা গ্রন্থি বা লিম্ফ নোডগুলি ফুলে ওঠে, বাইরে থেকে ফোলা লিম্ফ নোড স্পষ্ট বোঝা যায়।

● গলায় ব্যথা হয়, বিশেষ করে গলকণ্ঠ ও লিম্ফনোডের ফোলা অংশে ব্যথা করে।

যেসব কারণে থাইরয়েডের ক্যানসার হতে পারে

নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও আক্রান্তদের ওপর সমীক্ষা করে কয়েকটি ঝুঁকির কথা জানা গেছে। মেয়েদের থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় বেশি। তাই মেয়েদের কোনোরকম সমস্যা হলে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

● হেড অ্যান্ড নেক ক্যানসারে হাই ডোজ রেডিয়েশন নিতে হলে থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। তাই এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য কারণেও যাঁদের রেডিয়েশনের মধ্যে থাকতে হয় তাঁদেরও ক্যানসারের রিস্ক থাকে।

● কয়েকটি জেনেটিক সিনড্রোম থাকলে এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কর্কট রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন মাল্টিপল এন্ডোক্রিন নিওপ্লেসিয়া, কাউডেনস সিনড্রোম জাতীয় অসুখ থাকলে নিয়মিত চেকআপ করাতে ভুলবেন না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পুরোপুরি সারানো যায়

রোগের লক্ষণ ও মায়াজম অনুযায়ী চিকিৎসা হলে আধুনিক হোমিওপ্যাথিতে থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে দারুণ ফল পাওয়া যাচ্ছে। থাইরয়েড ক্যানসার ধরা পড়লে দরকার মতো সার্জারি ও রেডিয়েশনের সাহায্যে রোগমুক্ত করা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাইরয়েড ক্যানসার সমূলে বাদ দিলেও দু'য়েকটি ক্যানসারযুক্ত কোষ থেকে যায়। সেখান থেকে এই রোগ ফিরে ফিরে আসার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। আমার ৩৮ বছরের ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাইরয়েড ক্যানসার পুরোপুরি নির্মূল করে রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। □

হিন্দু শাস্ত্রে দশাবতারের অন্যতম

ভগবান বুদ্ধদেব

ড. জিষ্ণু বসু

শাস্ত্রমতে ভগবান বিভিন্ন যুগে অবতার রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ স্বরূপ, তাই কৃষ্ণকে দশাবতারের মধ্যে ধরা হয় না। বুদ্ধদেব দশাবতারের মধ্যে স্থান পেয়েছেন গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৩৩০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। ঠিক তেমনই বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে স্থান পেয়েছেন বিষ্ণু। সারা পৃথিবীর অনেক অংশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের থেরবাদ প্রচলিত। সেখানের গুম্ফাতে, পুঁথিতে উপস্থিত দশ অবতার-সহ বিষ্ণু।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের জন্য যে বিবর্তনবাদ আর মানবসভ্যতার ইতিহাসের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দশাবতার একেবারে সঠিক। ডারউইনের বিবর্তনবাদের ছবিই যেন মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার। মানুষ আগে (হোমোসেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে প্রথম এসেছিল সেটি সম্ভবত আফ্রিকায় যেখানে বামন অবতার আসাটাই পিগমি জনগোষ্ঠীর সঠিক দ্যোতক। তারপর 'হান্টার গ্যাদারার' বা শিকারি জনগোষ্ঠী থেকে কৃষিকাজের প্রতীক হলধারী বলরাম। আমাদের হিন্দুধর্মের শাস্ত্রকাররা এই উত্তরটা ঠিকঠাক বুঝতেন।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মথুরা থেকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায় ভাগবত দর্শন। এই ভাগবতবাদী আন্দোলনের সময় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে দশাবতারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তথাগত বুদ্ধদেব। মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য সর্বত্র বিরাজ করতে থাকেন বুদ্ধ।

দশাবতারে বুদ্ধের এই প্রবেশ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অনন্য পর্যায়। বৌদ্ধ ধর্মের শাশ্বতবাদ ও অনাত্মাবাদ বা নাস্তিবাদের মধ্যেকার এক অতি কঠিন আধ্যাত্মিক সত্য হিন্দুধর্ম নিজের মধ্যে সরলভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যিশুখ্রিস্টের নিকট যেমন ইহুদি ধর্ম, তেমন বুদ্ধদেবের কাছে হিন্দুধর্ম। যিশু ইহুদি হয়ে জন্মেছিলেন আর গৌতম বুদ্ধ রাজকুমার সিদ্ধার্থ হয়ে হিন্দুঘরে জন্মেছিলেন। ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছিল কিন্তু হিন্দুরা বেদদ্রোহী বুদ্ধকে দশাবতারের একজন অবতার হিসেবে ভগবানের স্থান দিয়েছে। সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে জীবনের আটটি সত্যকে ধর্মের মূল উপাদান রূপে প্রচলন করেন। অনাত্মলক্ষণ সূত্রে তথাগত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। আবার শিষ্য আনন্দকে বলেছেন যে অনাত্মা বা উচ্ছেদবাদই শাশ্বত সত্য নয়। কিন্তু এই ভাবনা সারা পৃথিবীকে প্রায় দু' হাজার বছর মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

চীনের প্রখ্যাত দার্শনিক হু শি বলেছিলেন, 'একজনও সৈন্য সীমান্তের এদিকে না পাঠিয়েও ভারতবর্ষ চীনকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবে দুই হাজার বছর শাসন করেছিল। সেটা বৌদ্ধধর্মের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। আর চীনও সেই সময় জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধনসম্পদে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছিল। এমন এক গৌরবময় সময়ে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের দুনহাং শহরে পৃথিবীর প্রথম বই ছাপানো হলো। সিল্করুটের ধারে এই শহরে যে পুস্তকটি ছাপানো হয়েছিল সেটিও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপা বইটি হলো বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র বা ডায়মন্ড সূত্র। চীন কেবল সারস্বত ধার্মিক নয়, সামরিক বিদ্যাতেও সর্বোচ্চস্থানে পৌঁছেছিল এই সময়ে।

ভারতবর্ষও জ্ঞানে গরিমায়, শৌর্যে বীর্যে, প্রাণপ্রাচুর্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌঁছেছিল এই বৌদ্ধ শাসনের যুগে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্তমান ভারতে বলেছেন, 'বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাটদের ন্যায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখনো ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান।'

এই অসাধারণ সাফল্যের নেপথ্যে ছিল হিন্দুর মননের গভীরতা আর তথাগত বুদ্ধের উদারতা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাতে,

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে অতি সুন্দর বর্ণনা সেই দিনের। নিবেদিতা বৌদ্ধগয়াতে গিয়ে বজ্রচিহ্ন দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নতুন ভারতের জাতীয় প্রতীক হোক বজ্রচিহ্ন। তিনি কাপড়ে নিজে হাতে বজ্রচিহ্ন ও বন্দেমাতরম্ সুতোর কাজে লিখে ভারতের জাতীয় পতাকার প্রস্তাব করেছিলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেদিন দেহ ছেড়ে ছিলেন, রোগে ভোগা শরীর, গলায় বড়ো কষ্ট। তবু এক ভক্ত দূর থেকে এসেছেন। টানা দু'ঘণ্টা তিনি তাকে 'যোগ'-এর বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তারপরই শরীর ছেড়ে দিল। শশিভূষণ ডাক্তারকে ডাকতে গেলেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথের সামনেও ভেসে উঠেছিল আড়াই হাজার বছরের পুরাতন দৃশ্য। কুশীনগরের এক কুঞ্জবনে অর্ধশায়িত তথাগত মহানির্বাণের প্রতীক্ষায়। সেদিনও চারজন এসেছিলেন উপদেশ নিতে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বুদ্ধ এক এক করে সবাইকে উত্তর দিয়েছিলেন শিষ্যদের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করেই। বঙ্গদেশের গৌরবও অনেকটাই ভগবান বুদ্ধের কৃপাতে। এই যে বিপুল সম্পদ, যার লোভে তুর্কি, আরব, আবিসিনিয়ান থেকে ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ সবাই এসেছিল বাঙ্গলার গাঙ্গেয় অববাহিকায় এই শস্য, এই শিল্প, এই বাণিজ্য তৈরি করেছিল কে? কোন যুগে?

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে সেই সময়টিকে সঠিকভাবে ধরা আছে। নদীর উপরে মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার বড়ো জাহাজ, তাতে তোলা হচ্ছে বহুমূল পণ্য, বিপুল লোক সমাগম, সর্বত্র প্রাচুর্যের ঘনঘটা। সেই বিপুল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি টুকরো ছবি— "কোথাও বড়ো বড়ো অক্ষরে মহাজনের নাম লেখা— কোথাও বা লেখা— 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'।"

সেই স্বর্ণযুগ বঙ্গভূমিতে আর ফিরে আসেনি। ■

'ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে না লইয়া বৌদ্ধরা দাঁড়াইতে পারেন না এবং ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারেন না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব আন্দোলনে বুদ্ধদেবের গভীর প্রভাব আছে। স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে ২৫ মার্চ ১৮৯৮ সালে দীক্ষা দেওয়ার সময় এবং তার একটি বছর পরে ১৮৯৯ সালে ২৫ মার্চ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার সময় বুদ্ধদেবের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। 'বিশ্বের জন্য নিজেকে বলি দেওয়া খুব ভালো কাজ হতে পারে কিন্তু তাঁর কী অধিকার যে তিনি নিজ স্ত্রী-পুত্রকেও বলি দেন? (তখন) তাঁর মনে হলো যে তিনি যে আত্মোৎসর্গ করতে যাচ্ছেন, তাতে স্ত্রী যশোধরার ভাগ আছে। যশোধরার বিহনে গৌতমের যে দুঃখ হবে, তার ফলেই তিনি স্বামীর তপস্যার এবং জ্ঞানের অর্ধেক ভাগ পাবেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত দীক্ষা দেওয়ার দিনেও নিবেদিতার রাজা (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁকে মাটিতে বসিয়ে বুদ্ধের কথা বলতে থাকেন।

আলোর পথিক গৌতম বুদ্ধ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব যার প্রকৃত নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম, তিনি ৪৬৩ খ্রিস্টপূর্বে বর্তমান নেপালের লুম্বিনির শাক্যবংশে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শুদ্ধোদন ও মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। মাসি গৌতমীর কাছে তিনি ছোটোবেলায় মানুষ হন। যশোধরার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। নাম রাহুল। একদিন বাইরে পরিভ্রমণের সময় ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ছবি তাঁর মনকে বিচলিত করে তোলে। এই সময়েই তিনি দেখেন এক প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসীকে। তিনি তখন অনুভব করেন যে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সবই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এইসব জাগতিক বিষয়ের ঊর্ধ্বে। তিনি তখন সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি রাজপরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনকে বেছে নেবেন।

এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এই ঘটনা 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে পরিচিত। বহু জায়গা ঘুরে তিনি তারপর নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে সাধনা শুরু করেন। ওই স্থানে টানা ৪৯ দিন সাধনার পর তিনি বোধিলাভ করেন। এরপরই তিনি জ্ঞানদীপ্ত বা বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। সুজাতা নাম্নী এক বালিকার হাতে পায়েস খেয়ে তিনি সাধনাভঙ্গ করেন। এরপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে সারনাথের একটি মৃগদাবে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি তাঁর পূর্ব পরচিত পাঁচজনের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা হলেন বপ্য, অশ্বজিতস, কৌণ্ডিন্য, মহানাম ও ভদ্রীয়। এই পাঁচজনকে বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করেন। এটি 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' নামে পরিচিত।

তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা ইতিহাসে 'চারটি আর্য সত্য' নামে খ্যাত। তিনি বলেন যে, সমগ্র পৃথিবী দুঃখময়। কিন্তু এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় আছে। এই দুঃখ মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে তিনি আটটি বিষয় মেনে চলতে বলেন— যা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। তিনি চরম কৃচ্ছসাধন ও চূড়ান্ত ভোগবিলাস এই দুটি পথই পরিহার করতে বলেন। এর মাঝামাঝি পথই তাঁর মতে ছিল শ্রেষ্ঠ পথ। তাই বুদ্ধের প্রচারিত দর্শন 'মজঝিম পন্থা' হিসেবেও পরিচিত। তিনি ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বে প্রায় ৮০ বছর বয়সে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন বৈশাখী পূর্ণিমায়, যা 'মহাপরিনির্বাণ' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন জীবক, যিনি বিম্বিসার ও অজাতশত্রুরও চিকিৎসক ছিলেন।

সনাতন ধর্মে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে দেখা হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্মকেও হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে মনে করা হয়। পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, নারদ পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরাশর হোর শাস্ত্রেও বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্কন্দ পুরাণে বুদ্ধকে বাসুদেবের অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধেরও ভাস্কর্য আছে এবং তাঁর পূজাও হয়। ঐরাবতেশ্বর মন্দিরে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বুদ্ধের ভাস্কর্য আছে। অগ্নি পুরাণে বুদ্ধের মূর্তি কীরকম হওয়া উচিত তার বর্ণনা আছে। এই পুরাণ অনুযায়ী বুদ্ধের মূর্তি হবে শান্ত, গাত্রবর্ণ হবে ফর্সা, কানগুলি হবে লম্বা, তিনি একটি বস্ত্র পরিধান করে থাকবেন এবং একটি পদ্মফুলের ওপর বসে থাকবেন। বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ রিস ডেভিডস্ লিখেছেন, 'গৌতমবুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী বলে যে ধারণাটি রয়েছে তা ঠিক নয়। গৌতম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বড়ো হয়েছিলেন, বেঁচে ছিলেন এবং দেহত্যাগ করেছিলেন একজন হিন্দু হিসেবেই'। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন যে, 'বুদ্ধ কোথাওই উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি উপনিষদের অবস্থানকেই মেনে নিয়েছিলেন।'

(লেখক একজন ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট অধ্যাপক)

বুদ্ধপূর্ণিমা এখন হিন্দুদের কাছেও পরম পবিত্র

প্রদীপ মারিক

হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হলো বুদ্ধপূর্ণিমা। হিন্দু বর্ষপঞ্জি অনুসারে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। বুদ্ধপূর্ণিমার দিনেই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। এই দিনে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। এই দিনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা স্নান করে শুচিবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে বুদ্ধের বন্দনা করেন। ভক্তরা প্রতিটি মন্দিরে বহু প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এবং ফুলের মালা দিয়ে মন্দির, গৃহ সুশোভিত করে বুদ্ধের আরাধনায় নিমগ্ন হন। এদিন ঘর পরিষ্কার করে বাড়ির চারিধারে পবিত্র গঙ্গাজল ছেটানো হয়। বাড়ির প্রবেশ পথে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বোধি বৃক্ষের উপাসনা করেন। রঙিন পুষ্পমালা গাছে বাঁধা হয় এবং ভক্তেরা বৃক্ষের গোড়ায় দুধ ও জল ঢালেন। এই দিনে গরিব-দুঃখীদের দান করতে হয়। গৃহীভক্তেরা সংসারের মঙ্গল কামনায় এদিন দান ধ্যান করেন। কারণ স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'সবেব সত্তা ভবন্তু সুখীতত্তা' অর্থাৎ জগতের সব প্রাণী সুখী হোক। সেই জন্যই তো সকল মানুষের আত্ম-উপলব্ধি এবং বিবেকবোধ জাগ্রত করার অঙ্গীকারই বুদ্ধপূর্ণিমার সঠিক তাৎপর্য।

পুণ্যবতী মায়াবতী রাজপালঙ্কে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রানি স্বপ্নে দেখলেন, কপিলাবস্তু নগরীতে চাঁদের জোৎস্না ছড়ানো রমণীয় হ্রদে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। একটা সাদা হাতি সেই হ্রদের জলে জলকেলিতে ব্যস্ত। হাতিটা মায়াবতীকে দেখে এগিয়ে এসে একটা পদ্ম মায়াবতীর ডান হাতের কুক্ষিতে রাখলেন। এক দেবদূতের আগমনে শিহরিত হলো রানির মন। শাক্যরাজ্যের প্রাণপুরুষ রাজা শুদ্ধোধনের রাজমহিষী তিনি। রানি মায়াদেবী রাজা শুদ্ধোধনের কাছে তার স্বপ্নের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন।

রাজা কালবিলম্ব না করে রাজ জ্যোতিষীদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলেন। জ্যোতিষীরা বললেন, রানি মায়াদেবী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন, এই পুত্র যশস্বী এবং মহাতেজস্বী মহাপুরুষ হবেন। সমস্ত জীবের দুঃখহারী এবং মহাজ্ঞানী পুত্রের জনক হবেন এ কথা ভেবে রাজার মনে আনন্দের অন্ত নেই। কিন্তু এরই মধ্যেই জ্যোতিষীরা নির্মম সত্য কথাটা বললেন, পুত্রসন্তান জন্মের সাত দিনের মধ্যে রানি মায়াদেবীর অকালমৃত্যু ঘটবে। একদিকে মহামানবের আগমন সংবাদ, অন্যদিকে রানির মৃত্যুসংবাদ শুদ্ধোধনকে বিচলিত করে রেখেছিল। মায়াদেবী তার পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য রাজার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। রানির কথামতো রাজা শুদ্ধোধন রানির বাপের বাড়ি যাওয়ার সব বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করেন। সন্তানসম্ভবা মায়াদেবী এবং তার সখীদল রথে করে বাপের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। তখন তার মধ্যে অপূর্ব স্নিগ্ধতা, বেদনা, করুণা বলতে গেলে অনুপম সৌন্দর্যের সমুজ্জ্বল উপস্থিতি বিরাজমান। তিনি হবেন আলোকসুন্দর দিব্য মানবের জন্মদাত্রী। সৃষ্টির পূর্ণতা এবং অনুপম সৌন্দর্যের অনুপম উপস্থিতি তার মধ্যে। বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে লুম্বিনী কাননে পৌঁছনো মাত্রই মায়াদেবীর প্রসববেদনা শুরু হলো। লুম্বিনী উদ্যান হয়ে উঠলো সৃষ্টির উৎসারিত আলোক সমুদ্র। এখানে এক পদ্মপলাশলোচন ব্রহ্মযোগযুক্ত জ্যোতির্ময় শিশুর জন্ম দিলেন মায়াদেবী।

৬২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্ম হয় সিদ্ধার্থের। মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে মাতা মায়াদেবী এবং নবজাতককে ফিরিয়ে আনা হলো কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে। এই দিনটি হলো বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। দিব্যজ্ঞানস্বরূপ সাধনাসম্ভূত জ্যোতির্ময় শিশুর জন্মের সাত দিনের মধ্যেই মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। রাজা শুদ্ধোধনের দ্বিতীয় স্ত্রী গৌতমী শিশু সিদ্ধার্থের সব দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বিমাতা তথা মাসির অসীম স্নেহপরশে সিদ্ধার্থের শৈশব কাটতে লাগল। মাতা গৌতমীর কাছে তিনি মানুষ হয়েছিলেন বলে তার নাম হয় গৌতম।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষাদানের জন্য শুদ্ধোধন শাক্য রাজ্যের পণ্ডিতপ্রধান বিশ্বামিত্রকে নিযুক্ত করেন। সিদ্ধার্থ অল্প

দিনেই মেধার বিকাশ ঘটাবেন। তার কোনো শিক্ষা বাকি রইলো না। সব বিদ্যায় তিনি পারদর্শী। অশ্ব-প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন। কিন্তু প্রতিযোগিতা জিতেও তার কোনো আনন্দ নেই উৎসাহ নেই, রাজা শুদ্ধোধন সিদ্ধার্থের জন্য বিলাসবহুল জীবনের বন্দোবস্ত করলেও তিনি সব পরিত্যাগ করেন। রাজ-জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। জন্মের সময় তাঁরা বলেছিলেন এই শিশু একদিন সিদ্ধ সাধক হবেন। যৌবনে পদার্পণ করে প্রাসাদের বাইরে একজন বৃদ্ধ মানুষ, একজন অসুস্থ মানুষ একজন মৃত মানুষ এবং একজন সন্ন্যাসীকে তিনি দেখতে পান। তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আধ্যাত্মিক পথে চলতে চলতে গয়ায় বোধিবৃক্ষের নীচে দীর্ঘ ছ' বছর কঠিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন তিনি সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধত্বে উন্নীত হন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে তিনি বোধিলাভ করেন। বিহারের এই স্থানটি তাই বুদ্ধগয়া হিসেবেই পরিচিত। এই দিনটিও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা।

হিন্দুধর্ম অনুসারে বিষ্ণুর নবম অবতার মনে করা হয় গৌতম বুদ্ধকে। দশবতার স্তোত্রমে তাঁর সুন্দর উল্লেখ রয়েছে— 'নিন্দসি যজ্ঞবিবেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্। কেশব! ধৃত বুদ্ধশবীর, জয় জগদীশ হরে।। বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব গৌতম বুদ্ধের জন্মোৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের শুভজন্ম, বোধিজ্ঞান ও মহাপরিনির্বাণ লাভ--- এই ত্রি-স্মৃতিবিজড়িত বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। হিন্দুরাও এই দিনটিকে সমানভাবে বুদ্ধের স্মরণ ও মনন করে। জগতের কল্যাণ, মানুষের জীবনে সঠিক পথ দেখিয়ে হিংসার পথ বন্ধ করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তার সাধনা আর সুখ কামনা ছিল জাগতের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য।

বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধদের জীবনযাত্রায় লক্ষ্য করা যায় তারা আন্তরিক ভাবে সেবাধর্মে খুবই বিশ্বাসী। মানুষের কল্যাণের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তাদের অসুখী করে। বুদ্ধের এই দর্শন এবং উপদেশ সংবলিত গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। এই ধর্মগ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়। এই তিনটি পিটক হলো বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি, বাক্স, পাত্র ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকদের মত অনুসারে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই গ্রন্থের কাজ শুরু হয় গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর থেকে। প্রায় তিনশো বছরে তিনটি সঙ্ঘযানের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়। আর এতে অংশগ্রহণকারী পণ্ডিত অর্হত ভিক্ষু ছিলেন প্রায় ২২০০ জন। প্রায় ৮৪,০০০ বুদ্ধ বচন বা বুদ্ধ উল্লিখিত বিষয় বা শাস্ত্রবাক্য ত্রিপিটকে বিদ্যমান। বুদ্ধের সময়কালে তার শিষ্যরা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধ্যানে-জ্ঞানে অত্যন্ত চেতনা সম্পন্ন ছিলেন। এই সময় ভিক্ষুকদের মধ্যে সূত্রধর, বিনয়ধর ও মতিকাধর নামে তিন ধারার সাধনাকারী ভিক্ষু ছিলেন। এই স্মৃতিধর ভিক্ষুরা শিষ্য পরম্পরায় নিরলস অধ্যয়ন করে ত্রিপিটক গ্রন্থ রচনা করেন। এই ভিক্ষুরা খুবই স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর ছিলেন। এই ধর্মগ্রন্থ ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ দিয়ে থাকে।

সংসারী মানুষ জীবন সংগ্রামে নানাভাবে আমরা অসহায়। মানবসৃষ্ট প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসতে পারাই হলো একজন মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভরসা দেবে কে? ভরসা দেবে প্রতিটি মহামানব এবং তাদের জন্মতিথি। সমস্ত শুভ তিথির মাহাত্ম্য উপাসক দেবতা চন্দ্র, সূর্যের ওপর নির্ভর করেই হয়ে থাকে। সব পূর্ণিমা তিথিই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো গুরুত্ব বহন করে আনে। বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে সব থেকে বেশি স্মরণীয়, কারণ এই দিন ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের দিন। ■

ফঃ ৪

তথাগত বুদ্ধের নীতিশিক্ষা বেদের নীতিশিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

দীপক খাঁ

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ভারতের দুটি বৃহৎ ধর্মের ধারা। ইহুদি ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম যেমন সম্পর্কিত, সেইরূপ হিন্দু-বৌদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খ্রিস্টধর্ম যেমন ইহুদি ধর্মোপজাত, বৌদ্ধধর্ম তেমনি হিন্দুধর্মোপজাত। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও নৈতিক আদর্শগুলিও হিন্দুধর্মের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিধৃত হয়ে আছে। বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তি- ঈশ্বরের কোনো পূজা নেই, নেই তাতে অনন্তকাল ধরে শাস্তিরও ব্যবস্থা। ইহুদি এবং খ্রিস্টধর্মে কিন্তু আমরা সেরকমই ঈশ্বরকেই দেখি। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তখনই তিনি তাঁর নীতিধর্ম প্রচার করেছিলেন। কোনোদিনই তিনি তাঁর অনুগামীদের কোনো ব্যক্তি-ঈশ্বরকে পূজা করতে কিংবা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেননি।

এ জন্যই খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন যে বৌদ্ধধর্ম কোনো প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম নয়। কিন্তু বৌদ্ধদের মতানুসারে বৌদ্ধধর্ম এবং তাঁর নৈতিক অনুশাসনগুলি ইহুদিধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মতোই প্রত্যাদিষ্ট। বৌদ্ধরা মনে করে, বৌদ্ধধর্মের নীতিতত্ত্ব প্রত্যাদেশ অপেক্ষাও অধিক, কারণ সেগুলির ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম। কারণ সেগুলি কোনো কিংবদন্তী কিংবা ঐতিহ্যগত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধ সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি, তিনি নীতিতত্ত্ব ও ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিরও অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি সত্য ও শাশ্বত নিয়মগুলি আবিষ্কার করেন। তখনই তিনি মানুষের ভালোর জন্য নির্ভয়ে তা প্রচার করেছিলেন। অভ্যাসবশত তুমি যাতে আসক্ত হয়েছ, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করো না, তোমার শিক্ষক ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কার্যত প্রামাণিকতায় শুধু শুধু বিশ্বাস করো না, পরন্তু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা যা সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে হবে, একমাত্র তাই গ্রহণ করবে এবং তাঁর জন্যই জীবনধারণ করবে। এই ভাবে যুক্তিসম্মত জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে বুদ্ধ পুরোহিত সম্প্রদায়, প্রাচীন ঋষি ও হিন্দুদের প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বেদের প্রাধিকারকে বর্জন করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের নীতিশাস্ত্রকে বর্জন করেননি। ওই নীতিশাস্ত্র হচ্ছে হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্মের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর।

হিন্দু হিসেবে ভূমিষ্ঠ ও লালিতপালিত হয়ে বুদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই বেদসকল পাঠ করেছিলেন, তাদের নীতিসংহিতা অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর নিজের মহান শিক্ষায় ওই নীতি সংহিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হিন্দুদের নীতিসংহিতা মোজেসেরও বহু শতাব্দী পূর্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। বেদের মতে প্রতিটি মানুষ তাঁর জন্মসময় থেকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা ও পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত চার প্রকার কর্তব্যে আবদ্ধ। এই চার প্রকার কর্তব্যকে বিভিন্ন ঋণের মতো মনে করা হয়। প্রতিটি মানুষকে এই চার ঋণ জীবৎকালে পরিশোধের কথা স্মরণ রাখতে হয়।

প্রথম ঋণ হলো সমগ্র মানবজাতির প্রতি ঋণ। সকলের মঙ্গলের জন্য সৎ কর্ম করে ওই ঋণ পরিশোধ করা যায়। দ্বিতীয় ঋণ হলো ঋষিঋণ। ঋষি অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা মহৎ, সাধু— যাঁরা

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতম আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন, নিজ নিজ জীবনে তা পালন করে আমাদের ওই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে পিতৃঋণ। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র হয়ে জীবনযাপন করে এবং সন্তানকে নৈতিকতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রতিপালন করে ওই ধর্ম পরিশোধের কথা ভাবতে হবে। চতুর্থ ঋণ হলো দেবঋণ। দেব অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মা। পূজা, ভক্তি ও আত্মত্যাগ দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

এই সকল কর্তব্য পালনের জন্য প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক হিন্দুর জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তর হলো ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন। নৈতিক শিক্ষা, বৈষয়িক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার জন্য এই স্তর। শৈশবকাল হতে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত এই আশ্রয়ের ব্যাপ্তি। এই বয়সে গুরু বা শিক্ষকের সঙ্গে বসবাস করে। সকলে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করে। এ সময়ে সে নৈষ্ঠিক ও নিঃস্বার্থ জীবনযাপন ও দ্বিধাহীন চিত্তে গুরুর আদেশ পালন করে থাকে। এরা পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে

গৃহে ফিরে আসে, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং গৃহস্থ জীবনযাপন করে। তারপর উত্তম স্বামী ও যথার্থ পিতার কর্তব্য পালন করে সে অবসর গ্রহণ করে এবং বনে বাস করতে থাকে বা যে কোনো নির্জন স্থানে তাঁর উচ্চ আদর্শের চিন্তায় দিন কাটাতে থাকে। পঞ্চাশোর্ধ্ব এ জীবন। এরপর ধীরে ধীরে সন্ন্যাসের আশ্রমে প্রবেশ করে। এ জীবন পূর্ণরূপে ত্যাগের জীবন। জগতের সকল আমোদ-প্রমোদে সে নির্লিপ্ত থাকে। এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।

আবার প্রাচীনতম বেদে নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে যখন এক শিষ্য তার গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করল নীতিপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হবার জন্য তাঁকে কী করতে হবে? উত্তরে গুরু তিনটি সংস্কৃত শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন, দম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্। প্রতিটি শব্দ 'দ' অক্ষর দিয়ে শুরু। প্রথম দম্যত অর্থ নিজেকে দমন কর, রিপুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর, অহংকার, অস্মিতা ও স্বার্থপরতাবোধকে জয় কর। দ্বিতীয় শব্দ 'দত্ত' অর্থাৎ মুক্ত হস্তে দান কর এবং দরিদ্রের প্রতি সদয় ও অভাবগ্রস্তের প্রতি বদান্য হও। শেষ শব্দ 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ হচ্ছে সকলের প্রতি দয়ালু, সহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুকম্পাশীল হও।

বেদ যে সকল নীতি শিক্ষা দিয়েছে, তার মধ্যে মহত্তম হচ্ছে বিশ্বপ্রেম। শুধুমাত্র প্রতিবেশীকে নয়, শুধুমাত্র সমাজের সহযোগীদের নয় সমগ্র মানবজতিকেই। এ প্রেম উৎসারিত হবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন— 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাস'। কিন্তু কেন? এর উত্তর তিনি দেননি। বেদে এর উত্তর আছে। বেদের একটি সূত্র আছে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই হচ্ছ তা' কারণ আত্মার দিক দিয়ে তুমি ও তোমার প্রতিবেশী একই। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বুদ্ধ তাঁর মহান্ সত্যগুলি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন— 'যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি তাদের ঘৃণা না করে ভালোবাসবে। কারণ শাশ্বত নৈতিক নিয়ম হচ্ছে সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন। ক্রোধকে ক্রোধদ্বারা প্রশমিত করা যায় না, পুনর্মিলন দ্বারাই তা সম্ভব। ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, কিন্তু প্রেম দ্বারা তা সম্ভব। এটা হলো একটি চিরস্থায়ী নিয়ম।

এই প্রকারই ছিল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নীতিশিক্ষা। 'শুভ দ্বারা অশুভকে জয়' হচ্ছে সুবর্ণ নীতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। যদিও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে 'আত্মৌপম্যেনব সর্বত্র দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ' অর্থাৎ 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্যের কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাঁরা নিজেরা অন্যের সঙ্গে যে ব্যবহারই করে থাকেন'— বাক্যরূপে ওই সুবর্ণ নীতি বিদ্যমান ছিল।

তথাগত বুদ্ধকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— 'পাপ' কাকে বলে? তিন উত্তরে বলেছিলেন, 'বন্ধু হত্যা করা পাপ, চুরি করা পাপ, যৌন ভাবাবেগের বশীভূত হওয়া পাপ, কুকর্ম করা পাপ, গালাগালি দেওয়া পাপ, বাচালতা ও দ্বেষ করা পাপ, ঘৃণা করা পাপ, মিথ্যা মতবাদে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা পাপ।

তাই ভগবান বুদ্ধ সকলকে পাঁচটি অনুশাসন দিয়েছেন :

(১) জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করো না।

(২) তোমাকে যা প্রদত্ত হয়নি, তা গ্রহণ করো না।

(৩) মিথ্যা কথা বলো না।

(৪) নেশাকারক কোনো পানীয় পান করো না।

(৫) ব্যাভিচার করো না।

এই ভাবে দেখতে হলে বুদ্ধের নীতিশিক্ষা বেদের প্রাচীন নীতি শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্যে সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষে বুদ্ধই ছিলেন একমাত্র নীতি শিক্ষক। কিন্তু যাঁরা হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, বুদ্ধের পূর্বে এবং পরে হিন্দুদের মধ্যে আরও অনেক আধ্যাত্মিক শিক্ষক আবির্ভূত হয়েছিলেন। যারা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন। রামায়ণের নায়ক রাম ছিলেন আদর্শপুত্র, আদর্শ পিতা, আদর্শ নৃপতি এবং আদর্শ পতি। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর পত্নী সীতা ছিলেন একজন আদর্শ জায়া ও আদর্শ জননী।

আবার, মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে অপর এক মহান পরিত্রাতা ছিলেন। বুদ্ধের প্রায় আটশো বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত নৈতিক শিক্ষাগুলি ভগবদ্গীতার রূপ ধারণ করেছে। এই ভগবদ্গীতাকেই স্যার এডুইন আর্নল্ড আখ্যা দিয়েছেন 'স্বর্গীয় সংগীত'। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে : 'অন্তরের ও আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য নিরন্তর অভ্যাস করতে হবে। যা মানুষকে নিঃস্বার্থ করে তোলে, যে কাজ মানুষকে তার পাশব প্রকৃতির কথা ভুলিয়ে দেয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও পরম সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই শোধনকারী।' চিন্তায়, কথায় ও কাজে বিশুদ্ধতা হিন্দুধর্মের নীতি শাস্ত্রের অন্যতম আদর্শ। বৌদ্ধনীতি কথার সঙ্গে হিন্দু নীতিকথার কোনোরূপ পার্থক্য নেই। ■

গঙ্গা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে চন্দনযাত্রা ও মহাগঙ্গারতি

গত ২২ এপ্রিল গঙ্গ সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ির যৌথ উদ্যোগে কলকাতা মিলেনিয়াম পার্ক গঙ্গাবক্ষে একটি সুসজ্জিত স্টিমারে চন্দনযাত্রা ও মহাগঙ্গারতির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় গঙ্গা সমগ্র প্রমুখ তথা কানপুর প্রান্ত গঙ্গাসমগ্র প্রমুখ রাজেশ কুমার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, বিশিষ্ট জননেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল এবং বিকানীরের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশোকানন্দজী, তারাপীঠ রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের স্বামী হংসানন্দ মহারাজ-সহ বেশ কয়েকজন সাধুসন্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজেশ কুমারজী। অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন, গঙ্গা শুধু নদী নয়, তিনি আমাদের মা। এই মাকে আমাদের পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গঙ্গা সমগ্র প্রান্ত সংযোজক বৃজ উপাধ্যায় মা গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংকল্পবাক্য পাঠ করান।

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার এই চন্দনযাত্রায় গঙ্গামাহাত্ম্য, নৃত্য-সহযোগে মা গঙ্গার বন্দনা, নৃত্য সহযোগে দশাবতার স্তোত্র ইত্যাদি নানা উপস্থাপনা পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যশিল্পী গোপা চক্রবর্তী এবং তাঁর সম্প্রদায়। দুই শতাধিক ভক্তের দীপ জ্বেলে গঙ্গাপূজা ও মহাগঙ্গারতি অনুষ্ঠানকে ভাবগম্ভীর পরিবেশ প্রদান করে। গঙ্গামাতা কী জয় ধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষ মুখরিত হয়ে ওঠে। সাধু মহারাজ ও ভক্তরা ভাববিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে শুরু করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গঙ্গা সমগ্র প্রান্ত সংযোজক বৃজ উপাধ্যায়। শেষে দ্বিতীয়বার তিনি সংকল্পবাক্য পাঠ করান। প্রসাদ বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ত্রিপুরায় 'মাসিক ত্রিলোচন' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৬ এপ্রিল বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে মাসিক জাগরণ পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো নজরুল কলাক্ষেত্রের অডিটোরিয়ামে। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলকান্তি রায়, ত্রিপুরার পূর্বতন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন এবং প্রান্ত প্রচারক নিখিল শঙ্কর নিবাসকর।

প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলকান্তি রায় ত্রিপুরার ত্রিলোচন রাজার নামানুসারে পত্রিকার নামকরণ হয়েছে বলে জানান। পূর্বতন উপমুখ্যমন্ত্রী পত্রিকার সমৃদ্ধি কামনা করেন। প্রান্ত প্রচারক তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে বলেন, ত্রিলোচন আমাদের সনাতনী পন্থায় বিকশিত হবে। ।

সুব্রত রায়ের সম্পাদনায় বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র ত্রিপুরা শাখার পক্ষে তাপস রায় কর্তৃক চার পৃষ্ঠার পত্রিকাটি বাংলা ও ককবরক ভাষায় প্রকাশিত হবে বলে জানা যায়। বন্দেমাতরম্ সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পার্বত্য ত্রিপুরা সত্যি প্রকৃতির এক অপরূপের সমষ্টি। ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে রয়েছে বাংলাদেশের কিছু অংশ আর পূর্ব দিকে রয়েছে অসম ও মিজোরাম। একসময় ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ এবং বার্মার কিছু অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের ভাষার নাম ককবরক। এই ভাষায় 'তৈ' হলো 'জল' আর 'প্রা' হলো নিকটে। দুইয়ে মিলে 'তৈ-প্রা' জলের নিকটবর্তী স্থান। পরবর্তীতে তেপ্রা, তিপ্রা শব্দ পরিবর্তিত হয় বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ত্রিপুরা নাম ধারণ করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৫০০ অব্দের ভিতরে রচিত মহাভারতে ত্রিপুরা নামটি পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত রাজমালাতে (ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের কাহিনি) ত্রিপুরার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগের পূর্বাবধি অঞ্চলটি মাণিক্য রাজবংশ ধারাবাহিকভাবে শাসন করত। ব্রিটিশ ভারতে ত্রিপুরা একটি স্বাধীন করদ রাজ্য ছিল। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে রত্ন মাণিক্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের সূচনা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরায় অবস্থিত উদয়পুর ছিল স্বাধীন রাজতান্ত্রিক ত্রিপুরার রাজধানী। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য পুরাতন আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজধানী বর্তমান আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে ত্রিপুরার আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কারণ, এই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে তাঁর প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করেন এবং বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজধানী আগরতলা থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে মাতাবাড়ি নামক স্থানে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি অবস্থিত। উঁচু-নীচু পাহাড়, নানান জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা ভারতের জন্য একটা অলংকারও বটে। অনেক জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে সকলের প্রাণস্পন্দনের সমন্বয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি তৃতীয় কনিষ্ঠ রাজ্য হলো ত্রিপুরা। মহাকাব্য মহাভারত এবং পুরাণে ত্রিপুরা রাজ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই ত্রিপুরার ত্রিপুরা

সুন্দরী মন্দিরের কথা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না।

১৪৫ তম মহারাজা ধন্য মানিক্য ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্মাণ করেছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহারাজা ধন্যমাণিক্য বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে কষ্টিপাথরে নির্মিত ত্রিপুরা সুন্দরী বিগ্রহ স্থানান্তরিত করে এই মন্দিরে প্রতিস্থাপন করেন। এই মন্দিরকে একান্ন পীঠের এক পীঠ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পুরাণের কাহিনি অনুসারে সতীর অঙ্গ যেখানে যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গায়ই পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। 'পীঠমালা তন্ত্র' গ্রন্থ অনুসারে উদয়পুরের এই স্থানে সতীর ডান পা পড়েছিল। বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্মিত মন্দিরে ত্রিপুরা সুন্দরী বা কালী বিগ্রহ স্থাপন নিয়ে ধন্য মাণিক্যের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও পরে তা দূর হয়ে যায় দৈববাণী শুনে। মন্দিরের শিলালিপি থেকে এই সব তথ্য জানা যায়। ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ উৎকৃষ্ট কষ্টিপাথরে নির্মিত। বিগ্রহের উচ্চতা ১ মিটার ৫৭ সে.মি.। প্রস্থ ৬৪ সে.মি.। দেবীমূর্তি একটি পাথরের বেদিতে স্থাপিত। দেবীর চার হাত। মুখমণ্ডল লম্বাটে, তুলনায় চোখ দুটি ছোট। নাক চ্যাপ্টা। শবাসনে শায়িত মহাদেবের বুকের উপর পা দুটি স্থাপন করে দেবী দণ্ডায়মান। দেবীর মাথায় আছে মুকুট ও জটারাশি। বর্তমান বিগ্রহের অবশ্য অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি ত্রিপুরার নিজস্ব স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। মূল দ্বার পশ্চিমমুখী। উত্তর দিকেও একটি দরজা আছে। মন্দিরের বাইরের পরিমাপ ২৪ ফুট x ২৪ ফুট। ভেতরের পরিমাপ ১৬ x ১৬ ফুট। দেয়াল ৮ ফুট চওড়া। মন্দিরের উচ্চতা ৭৫ ফুট। চার কোনায় আছে চারটি প্রধান স্তম্ভ। উপরের গম্বুজ বৌদ্ধরীতির অনুকরণে নির্মিত। এর উপরে সপ্ত কলস, তার উপরে পিতলের ধ্বজদণ্ড । এই মন্দিরের গঠনশৈলীতে বিভিন্ন প্রদেশ ও ধর্মের মন্দিরের গঠনরীতির সংমিশ্রণ রয়েছে। এটাই ত্রিপুরার নিজস্ব গঠন রীতি। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মিলনভূমি হিসেবে স্বীকৃত। মন্দিরের সৃষ্টিলগ্নে শৈব ও শাক্তের মিলন ঘটেছে। মন্দির নির্মিত হয়েছিল বিষ্ণুর উদ্দেশে, প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবী কালিকা। আজও এখানে মায়ের সঙ্গে নারায়ণ শিলার পূজা হয়। এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, এখানে আগত তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের ধর্ম বা বর্ণ পরিচয় জানতে চাওয়া হয় না। এই মন্দির সর্বজনীন। যে কোনও ধর্মের বা বর্ণের মানুষ এখানে পুজো দিতে পারেন।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পরাক্রমশালী সমসের গাজি উদয়পুর আক্রমণ করে এবং দখল করে। সে নিজেও ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিয়েছিল বলে কথিত আছে এবং তা 'গাজিনামা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এছাড়াও মুঘলরা এই অঞ্চল আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের এতোই ক্ষমতা যে মুঘল সৈনিকেরা পরাস্ত হয় এবং অনেক সৈনিক রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে মায়ের চরণে আশ্রিত কখনো পরাস্ত হন না।

মন্দির পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যেও সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। এই মন্দিরে অহিন্দুরাও খেতের প্রথম ফসল, গোরুর দুধ মাকে নিবেদন করেন। উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রিয় দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী। মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়। অন্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে। সন্ধায় আরতি হয়। পুরানো ঐতিহ্য অনুসারে দশমী তিথি ছাড়া প্রতিদিন পশুবলি হয়। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির বর্তমানে রাজ্য সরকার দ্বারা চালিত হয় এবং রাজন্য ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তির শর্তানুসারে গোমতী জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর 'সেবাইত' পদে অধিষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, গোমতী জেলা, সদস্য-সচিব এবং মন্দিরের পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির এবং আশেপাশের এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার মাতা 'ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ট্রাস্ট' গঠন করেছে। এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই সময় ত্রিপুরার রানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর অন্যতম শর্ত ছিল কয়েকটি মন্দিরের পরিচালনার ভার সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শর্তে রাজি হয়। এরপরই রাজ্য সরকার ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। পদাধিকারবলে মন্দিরের সেবায়েত গোমতী জেলার জেলাশাসক। ২০১৮ সালের নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর মাতাবাড়ি মন্দির পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে রাজ্য সরকার। সরকার পরিচালিত মন্দিরের সমস্ত কাজ হলেও আজকের দিনেও রাজপরিবারের বর্তমান প্রতিনিধি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নামে পুজোর অর্ঘ্য আহুতি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে বলে জানা গেছে।

নিয়মনিষ্ঠা করে প্রতিদিন ভোর চারটের সময় দেবী মায়ের মঙ্গল আরতি ও ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর সকাল আটটায় শুরু হয় দেবীর স্নানকার্য। এরপর সকাল সাড়ে নয়টায় বলি দিয়ে মায়ের পুজো শুরু হয়। আবার সন্ধে সাতটায় মায়ের সন্ধ্যা আরতি শুরু হয় এবং রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় ভোগ এবং মায়ের নিদ্রা সম্পন্ন হয়। তবে এই মন্দিরে বলির ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গিনী ডাকিনী যোগনীদের উদ্দেশে তা উৎসর্গ করা হয়। সেই বলির কিছু অংশ কল্যাণ সাগরের কচ্ছপ, মাছ ও সরীসৃপদের দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্দিরের পূর্বদিকে ৬.৪ একর জমি জুড়ে এই কল্যাণ সাগর অবস্থিত। সাগরের জলে বিভিন্ন জলজ প্রাণী, মাছ ও কচ্ছপ রয়েছে। পুণ্যার্থীরা পুণ্যার্জন করার জন্য এখানে এসে জলজ প্রাণীদের বিস্কুট, মুড়ি খাওয়ান। প্রতিবছর দীপাবলি উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে এক সুবিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা হয়ে উঠে মহামিলন ক্ষেত্র হিসাবে। ভক্তসমুদ্রে মানুষের প্রার্থনা মায়ের কাছে নিবেদন করা হয়।

বর্তমান বিজেপি সরকার এই মন্দিরের যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি উন্নয়ন মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। পুণ্যার্থীদের শুভার্থে অনেক পদক্ষেপই এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এই মন্দিরের গুরুত্ব ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ত্রিপুরাবাসীর গর্বের তীর্থভূমি। □

হিন্দুধর্মই মানবধর্ম : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

অমিত ঘোষ দস্তিদার

'ভদ্র' শব্দটি বৈদিক শব্দ। ঋগ্বেদে ১০।২০।১ মন্ত্রে প্রার্থনা—"ভদ্রং নো অপি বাত্যয় মনঃ"—আমাদের মনকে ভদ্র কর, প্রসন্ন কর, পবিত্র কর।

ত্রিশের দশকে ভাগবত গঙ্গেত্তরী ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী World Fellowship of Faiths-এর আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্পাদক হিসেবে আমেরিকায় প্রায় ছয় বছরকাল ছিলেন। সেই সময় চিকাগো শহরে একটি ধর্মসভা আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি ছিল আটদিনের। সাতদিন সাতটি বিশিষ্ট ধর্মকে বিষয় দেওয়া হয়েছিল—"Whether Religion can provide an adequate philosophy of life for a modern man"। অষ্টম দিনে হয়েছিল Final Resolution। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ধর্মসভাটির আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ। মহানামব্রতজী সেখানে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঠিক করা হয়েছিল সাতদিনে সাতটি ধর্মকে বিষয় দেওয়া হবে—"বর্তমান যুগে ধর্ম মানুষের জীবনের যোগ্য আদর্শ দিতে পারে কি না? খিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম এইভাবে ছয়দিনের জন্য এক একটি মতাদর্শকে নির্বাচিত করা হলো। কিন্তু হিন্দু ধর্মকে বিষয় দেওয়া হবে কি না? জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন আছে কি না? হিন্দুধর্মের পক্ষে কাউকে বলতে দেওয়া হবে কিনা?—তা নিয়ে প্রথমেই তুমুলভাবে প্রশ্ন উঠে গেল। কারণ হিসাবে জানানো হলো—হিন্দুধর্ম ক্ষয়িষ্ণু ধর্ম, হিন্দুধর্ম নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারছে না, দিনের পর দিন তাদের ধর্মের লোক কমে যাচ্ছে। কোনো ধর্মে ধর্মান্তর করতে হলে সবাই প্রথমে আসে হিন্দুধর্মের কাছে, কারণ যারা ধর্মান্তর করতে আসে তারা হিন্দুধর্মকে কাঁচামালের বাজার বলে মনে করে। অন্য কোনো ধর্ম থেকে তেমনভাবে ধর্মান্তর করা যায় না। কাজেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা মনে করে, যে ধর্ম নিজেকেই বাঁচাতে পারে না সে আবার বলবে কী? কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক বিপরীত মতে জানালো— গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি মহামানব যে ধর্ম থেকে এসেছেন, তার একটা দাম আছে বই কী! হিন্দুধর্মে লোক কম হলে কী হবে, হিন্দুধর্মের দান আছে; অতএব হিন্দুধর্মকেও রাখা হবে। হিন্দু ধর্মকেও বিষয় দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং মহানামব্রতজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হলো। একঘণ্টা বক্তব্য এবং এক ঘণ্টা আলোচনা—এইভাবে কার্যক্রম এগোতে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, ইসলাম ইত্যাদি করে সব

ধর্মমতের বক্তাগণ যে বক্তৃতা দিলেন তার মূল সুর একইরকম—ধর্মের পুরাতন চেহারাটাকে পালটে না দিলে, এই বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম মানুষকে কোনো যোগ্য আদর্শ দিতে অক্ষম। শেষদিনে মহানামব্রতজীর বক্তৃতার পালা—মহানামব্রতজী প্রথমেই বললেন, বর্তমান যুগের মানুষকে তার জীবনধারণোপযোগী একটা আদর্শ একমাত্র আমার ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মই দিতে পারে। আমার দেশের সংস্কৃত ভাষা থেকে 'ধর্ম' কথাটা এসেছে। ইংরেজি ভাষায় 'ধর্ম' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'রিলিজিয়ন'। এটা একটা মারাত্মক ভুল। সাহেবরা আমাদের দেশে এসে আমাদের শাস্ত্রের বহু ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। তাতে আমাদের যেমন উপকার হয়েছে তেমনি অপকারও কম হয়নি। এক্ষেত্রে যেমন বিরাট ভুল 'ধর্ম' শব্দের ইংরেজি অনুবাদ 'রিলিজিয়ন'। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁরা যদি ইংরেজিতে সংস্কৃত শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি বুঝতে চান তবে তো ভুল হবেই। 'ধর্ম' শব্দটা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদযোগ্যই নয়, কারণ সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' বলতে যা বুঝায় তার অনুবাদ করার মতো ইংরেজিতে কোনো প্রতিশব্দই নেই। আমাদের 'ধর্ম' কথার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা হলো—যা না থাকলে সে থাকে না, মোটামুটি সেটাই ধর্ম। ইংরেজিতে একে বলে essential property বা inherent quality. আমাদের শাস্ত্রমতে মানুষ মাত্রেরই ধর্ম মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বই মানুষের বিশেষত্ব; এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর তফাত, বাকি সবকিছুই এক। মনুষ্যত্ব বলতে প্রধানত পাঁচটি গুণ বুঝায়—''অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ। এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্ম্মস্য পঞ্চলক্ষণম্।।"—মনুসংহিতা। মনুষ্যত্বের পাঁচটি লক্ষণ হলো—চুরি না করা, শুচি থাকা, হিংসা না করা, সংযমী হওয়া এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া।

মহানামব্রতজী তাঁর অমূল্য ভাষণে উপরিউক্ত প্রতিটি লক্ষণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে উপস্থিত সকলকে সুন্দর ও সহজবোধ্যভাবে বুঝিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, মনুষ্যত্ব লাভের পর আছে দেবত্বলাভ। দেবত্বলাভের তিনটি উপায় বা পথ আছে। সংস্কৃত ভাষায় একে বলে 'মার্গ'। কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। এরপর তিনি প্রতিটি মার্গ উপস্থিত সকলকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, এই তিন মার্গে 'বৃত্তি'-র মাধ্যমে যেতে হবে। বৃত্তি প্রধানত তিনটি—জানবার ইচ্ছা, করবার ইচ্ছা এবং অনুভবের ইচ্ছা। 'বৃত্তি'-র মাধ্যমে একাধিক মার্গে যাবার জন্য একাধিক 'মত' আছে। সংস্কৃতে একেই বলে 'মতম্'। এই 'মতম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'রিলিজিয়ন্' হতে পারে। 'মতম্'-এর আর একটা ইংরেজি হলো ইজম, যেমন—চৈতন্যমত, বুদ্ধমত, মহম্মদমত ইত্যাদি। তাই অন্যান্য ধর্মগুলি 'ধর্ম' নয়, 'মতম্' বা ইজম। হিন্দুধর্ম হলো 'সনাতন ধর্ম', একে বলতে পারেন 'মানবধর্ম'। আরও সহজ করে সনাতনধর্মকে বলতে পারেন—Religion of a gentleman–ভদ্রলোকের ধর্ম। 'Hindu' শব্দের সাথে 'Ism' যোগ করে 'Hinduism' নামে একটি শব্দ তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা না বুঝে প্রকাণ্ড ভুল করেছেন। বহু 'Ism' বা 'মতম্' নিয়েই তো 'হিন্দুধর্ম' তৈরি হয়েছে, যেমন—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, আর্যসমাজী, ব্রাহ্ম ইত্যাদি। তাই হিন্দু Ism বা মতম্ নয়। হিন্দু একটা ধর্ম। বিরাট ধর্ম—তার মধ্যে বহু মত, পথ থাকতে পারে। এই ধর্ম সর্বসমাবেশক।

মহানামব্রতজী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ওই ধর্মসভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে এবার মূল প্রশ্ন অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মধ্যে ঢুকে বললেন, এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান মানুষকে প্রচুর সুবিধা দিয়েছে, এর ফলে পৃথিবীটা ছোটো হয়ে গেছে। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এটা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষ আজ মানুষের কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু মানবতার দিক থেকে মানুষ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এইখানেই এমন একটা ধর্মের প্রয়োজন যা সব মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। আমার ধর্ম 'সনাতন ধর্ম'। এই সনাতন ধর্মের ইংরেজি অনুবাদ করলাম Religion of a gentleman–ভদ্রলোকের ধর্ম। একে পালটে ফেলার কোনো ব্যাপার নেই। এবার ভাবুন, ভদ্রলোক হতে গেলে কী প্রয়োজন— চুরি করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, পরের ক্ষতি করবে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, চরিত্র সংযত রাখবে—এ সকল গুণ যার মধ্যে আছে সেই ভদ্রলোক। এ গুণগুলি সকলের অর্জন করা চাই—এর নাম 'মানবধর্ম'। এই মানবধর্ম শুধু আজকের যুগ কেন, সমস্ত যুগেই প্রয়োজন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই ধর্মমহাসভায় মহানামব্রতজী উপস্থিত সকলকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে ভাষণ এমনভাবে দিয়েছিলেন যে সভা কোনো তর্কে প্রবেশ না করে তাঁর যুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিল।

অষ্টম দিনে বা আট দিনের দিন Final Resolution অর্থাৎ সকলে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—এই সভার ভিতরে Religion of a gentleman বলে যে যে কথা বলা হয়েছে, সেটারই প্রয়োজন এই যুগে। চারিদিক থেকে জয়জয়কার ধ্বনি উঠল। ধর্মের জগৎসভায় হিন্দুধর্ম তথা মহানামব্রতজী বর্ণিত 'মানবধর্ম' শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলো। □

রামনবমীর শোভাযাত্রায় পরিকল্পিত হিংস্রতার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

তথ্য অনুসন্ধান কমিটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো রামনবমীর শোভাযাত্রায় দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ বন্ধ দরজার ভিতরে থাকা নিরীহ হিন্দুদের উপর টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে লাঠিচার্জ করেছিল। যে ভুক্তভোগী তথ্য অনুসন্ধান কমিটির কাছে এই বিবরণগুলো প্রকাশ করেছিলেন তিনি আরও বলেছেন যে এটা দেখা গেছে যে পুলিশ সেই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জনতা একত্রিত হয়ে এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে।

পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নরসিমা রেড্ডির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল বলেছেন যে মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ হুগলি জেলায় রামনবমীর শোভাযাত্রা চলাকালীন সহিংসতা চালানোর অনুমতি দিয়েছিল। বিচারপতি রেড্ডির নেতৃত্বে ওই কমিটির অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 'সব কটি ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং প্ররোচনামূলক।'

মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় বিচারপতি নরসিমা বলেছেন, 'রামনবমী শোভাযাত্রায় আক্রমণ করার জন্য একটা মিলিত প্রচেষ্টা হয়েছিল। শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা শুরু হয়। কিছু কিছু এলাকায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। দাঙ্গাবাজরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে পুলিশ নীরবে অন্যদিকে চলে যায়। আবাসিক এলকায় দাঙ্গাকারীরা জোরপূর্বক জায়গায় জায়গায় প্রবেশ করে এবং যখন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় (পড়ুন হিন্দু) রামনবমী উদ্‌যাপনে ব্যস্ত ছিল তাদের কাঁচের জানালা ভেঙে দেয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের হিংসা কবলিত এলাকায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী যেসব এলাকায় তারা ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করেনি, সেখানেও আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি মনে করি পুলিশ জানে যে সেসব জায়গা পরিদর্শন করার পর আমরা জানতে পারব সেখানে ঠিক কী ঘটেছে। আমাদের ভিকটিমদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের কেউ আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। আমরা মনে করি যে সাম্প্রতিক সহিংসতা বন্ধে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এবং তা ঘটতে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এই ঘটনায় স্বৈরশাসকের মতো আচরণ করছে।

এই অভিযোগ কেবল যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রেড্ডির নেতৃত্বে ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল করেছে তা নয়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও মমতা সরকারকে তীব্র নিন্দা জানিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে রামনবমী উপলক্ষ্যে সংঘটিত সহিংসতা প্রাথমিকভাবে 'পূর্ব পরিকল্পিত' ছিল। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনের শুনানি করার সময় এই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, হিংসাকবলিত এলাকা থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে পুলিশ-থানা থাকা সত্ত্বেও যখন মুসলমান জনতা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখন পুলিশ আক্রান্ত হিন্দুদের আকুল আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবগ্নানামের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই বিষয়ে শুনানি করেন। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, 'ইন্টরনেট সাসপেনশন সাধারণত হয় যখন একটা বহিরাগত বিপদ বা অনুপ্রবেশ ইত্যাদি হয়। কিন্তু ধর্মীয় শোভাযাত্রার জন্য কেন ইন্টারনেট স্থগিত করা হয়েছিল আমরা বুঝতে পারছি না। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবগ্নানাম যোগ করেছেন, হঠাৎ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল যখন লোকেরা হাঁটছিল! কিন্তু রাজ্যের রিপোর্ট প্রাথমিকভাবে দেখায় যে এই সহিংসতা সবই পূর্বপরিকল্পিত ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন 'ছাদ থেকে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ রয়েছে। স্পষ্টতই, কারও পক্ষে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ছাদে পাথর নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়'।

হাইকোর্ট ও ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি প্রথম এবং সর্বাগ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুলিশকে হিংসাত্মক ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে

ফঃ ৫

দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা ও হিংসার জন্য হিন্দুদের দোষারোপকারী সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকেও উড়িয়ে দিয়েছে।

অপইন্ডিয়া সংস্থা বিচারপতি রেড্ডির নেতৃত্বে গঠিত দলের অন্তর্বর্তীকলীন তথ্য অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন জোগাড় করেছে এবং এতে থাকা তথ্যাবলী স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রামনবমীতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা পূর্বপরিকল্পিত ছিল এবং ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্ররোচনার সরাসরি ফলাফল। প্রতিবেদনে ১৭ দফা তথ্য ও ৫টা দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

১। রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। রামনবমীর শোভাযাত্রায় হিংসা পূর্ব পরিকল্পিত, সাজানো এবং প্ররোচনামূলক ছিল বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সহিংসতার সরাসরি ট্রিগার ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপকভাবে জ্বালাময়ী ভাষণ'।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কমিটি বেশ কয়েকটি নেটিজেন ও মিডিয়ার ভিডিয়ো জুড়ে নিশ্চিত করে যে শান্তিপূর্ণ রামনবমী শোভাযাত্রাকে নিশানা করা হয়েছিল এবং দাঙ্গাকারীদের শোভাযাত্রা থামিয়ে তাদের নিশানা করার জন্য উচ্চমহল থেকে নির্দেশ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কমিটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ভিডিয়ো দেখেছে, যা টিভি চ্যানেলগুলোতে চালানো হচ্ছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীর শোভাযাত্রার ঠিক আগে ধরনায় বসে একটা ডাক দিয়েছেন। এক সাম্প্রদায়িক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে কোনো মিছিল 'মুসলমান এলাকা' (কথ্য ভাষায়) দিয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্যপ্রমাণ অনুসারে শান্তিপূর্ণ রামনবমী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া লোকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ভাবে অভিযুক্ত মুসলমান জনতার যখন হিংসা ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তখনই রাজ্য পুলিশ দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ না করে পালায়।'

২। মুখ্যমন্ত্রীকে 'পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট ও একদেশদর্শী' বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে, তিনি অসত্য দাবি করেছেন যে 'রামনবমীর শোভাযত্রার পথ' শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে অস্বীকার করে লিখেছে 'বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার পরে জানা যায় যে মোটেই পুলিশ-অনুমোদিত পথ পরিবর্তন করা হয়নি।'

৩। হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কা করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা চেয়েছিল, যেহেতু আগের বছরও হাওড়ায় ওই ১০০ মিটার পথ জুড়ে হিন্দুরা আক্রমণের শিকার হয়েছিল। রাজ্য পুলিশ হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এলাকার সংবেদনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেও হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কারণে শোভাযাত্রাকরীদের ভারী পাথর ছুঁড়ে আক্রমণ করা হয়েছিল যা বেশ কয়েকটি স্ব-নির্মিত ভিডিয়োয় দৃশ্যমান হচ্ছে'।

৪। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে একটা পক্ষপাতমূলক পদ্ধতিতে কাজ করছে, 'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা চাপে পুলিশ নিরাপত্তা না দেওয়ায় বা হিংসা প্রতিরোধে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় সাধারণ, শান্তিপূর্ণ, নাগরিক নিরপরাধ ব্যক্তি যারা কেবল ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব উদযাপন করছিল তারা একতরফা হিংসার বলি হয়েছে।'

৫। হিংসার পরে মুখ্যমন্ত্রী পক্ষপাতমূলক বিবৃতি দিয়ে চলেছেন সেখানে তিনি তদন্তের আগেই হিংসার জন্য হিন্দুদের দায়ী করে দাঙ্গাকারীদের ক্লিন চিট দিয়েছেন। '...মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়া কার্যত এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ক্লিন চিট দিয়ে দাবি করেছেন যে তারা রমজানের সময় কোনও অন্যায় করতে পারে না, যার ফলে সমগ্র হিংসার জন্য হিন্দুদের দায়ী করা হয়।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এই ভাষণটা আরও হিংসা ও দাঙ্গার উসকানি হিসেবে কাজ করেছিল।

৬। কীভাবে হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলমানদের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও উসকে দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 'এই ভিডিয়ো বিশেষভাবে আপত্তিকর, কারণ এতে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচিত প্রধান, যিনি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্তও, তিনি স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক হিংসা উসকে দিচ্ছেন এবং সংখ্যালঘু জনতার সামনে বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করছেন।'

৭। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অন্য এক জঘন্য মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী 'তদন্তের গতিপথকে প্রভাবিত করছিলেন এবং ঘৃণাভাষণের মাধ্যমে ধর্মীয় ভিত্তিতে জনতার হিংস্রতা উসকে দিয়েছিলেন'। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'সকলের হাতে এই ধরনের ভিডিয়োগুলো ঘুরছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে ধর্মের জিগির তোলা হয়েছে এবং হিংসা ও হত্যার ডাক দেওয়া হয়েছে।'

৮। রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার দিকে আঙুল তোলে যেখানে তিনি 'আল্লাহ' উল্লেখ করে কথা বলেছিলেন। 'প্রচলিত উল্লিখিত ভিডিয়োগুলোতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দেখা যায় যেখানে তিনি আল্লাহর নামে ধ্বনি দেওয়ার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে উসকে দিচ্ছেন এবং তাদের বলছেন শোভাযাত্রাকারীদের 'খতম' বা শেষ করতে।

৯। রাজ্য পুলিশকে অভিযুক্ত করে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সিআইএসএফ নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ হিংসাত্মক ঘটনায় আহত হয়েছেন, এটা রাজ্য পুলিশের অসৎ অভিপ্রায়ের কথা তুলে ধরে, তারা হিংসার পুরো সময় জুড়ে অবৈধ এবং সাম্প্রদায়িক পন্থাগুলোকে সমর্থন করেছিল।

১০। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ইতিহাস মাথায় রেখে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, 'আলোচ্য এই সমস্ত কাজগুলোকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও অপবিত্র করার ইতিহাসের আলোয় দেখা উচিত। এই কমিটি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইসলামপুর সফরে এই ধরনের ভাঙচুর করা মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন।' এতে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতিনিয়ত সরকারিতন্ত্র এবং তাদের মদদপুষ্ট গুন্ডাদের সৃষ্ট ত্রাসের মধ্যে বাস করে এবং এটা এই ঘটনায় প্রমাণিত যে রামনবমীর সময় হিংসার শিকার ব্যক্তিরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেনি কারণ তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত হুমকির ফলে ভয় পেয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুলিশ নির্যাতিতদের সাহায্য করেনি বরং মিথ্যা মামলার হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়েছে।

১১। খুব গুরুতর বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মিথ্যা গ্রেপ্তার করছে। 'নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুলিশ সিআরপিসির ১৪৪

নম্বর ধারাও বিচারাধীন বিষয়বস্তু এই অজুহাত দেখিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয়তা ঢাকার চেষ্টা করছে।'

১২। আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশেষ করে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কিছু পুলিশ অফিসারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'হিংসা ও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার জাভালগি ও হাওড়া পুলিশ কমিশনার ত্রিপাঠীর ভূমিকা শূন্য। হিংসাকবলিত এলাকায় পুলিশ খুব দেরিতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। উপরন্তু কমিটিকে দাঙ্গা-আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করার অনুমতি না দেওয়া এই উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মীরা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদের তোষণ করে অভূতপূর্ব হিংসা সৃষ্টি করেছে যা অসংখ্য নেটিজেনদের ভিডিয়ো ও নির্যাতিতদের ব্যক্তিগত ভিডিয়োতেও দেখা যায়।'

১৩। কমিটি যখন হাওড়া চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারদের কাছে মূল্যায়নের জন্য দাঙ্গা-আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি চেয়েছিল তখন অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উলটে পুলিশ কমিটিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন না করার জন্য চিঠি দিয়েছে। কমিটি চিঠির জবাব দেয়, পুলিশ যখন তাদের উত্তর দেয়নি তখন তারা এলাকা পরিদর্শন করার চেষ্টা করে, তাদের বাধা দেওয়া হয়, প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এটাকে মৌলিক অধিকারের দমন বলে অভিহিত করে কমিটি তখন এসএসকেএম হাসপাতালে একজন হিন্দু নির্যাতিতকে দেখতে যান, তিনি হিংসায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। পুলিশ এই মামলায় এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করে।

১৪। ৮ এপ্রিল, কমিটি দাঙ্গা-পীড়িত এলাকায় যাওয়ায় অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিল। ৯ তারিখে, কমিটি হাওড়ার দিকে অগ্রসর হয় সেখানে তাদের থামোনো হয়। এরপর তারা কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান, তিনি দেখা করতে বা তাদের কথা শুনতে অস্বীকার করেন। কমিটি অনুরোধ করে পুলিশ তাদের সঙ্গে এলাকায় যেতে পারে কোনও আশঙ্কা নেই, এই অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হয়।

'যেহেতু কমিটির হিংসাত্মক এলাকায় প্রবেশ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে খোলাখুলি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে তারা তাদের সুবিধামতো কমিটির সঙ্গে দেখা করতে পারবে। এর পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার ২৪ জন স্বেচ্ছায় কমিটির সঙ্গে একান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতায় দেখা করেন। হিংস্রতা ও প্রতিশোধের ভয় স্পষ্টত ছিল, কারণ যদি তাদের পরিচয় মিডিয়া বা অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে তবে তারা ভয় পেত যে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিংসাকবলিত ব্যক্তিরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাদের বেশিরভাগই হয় রামনবমী উপলক্ষ্যে হাওড়ার শিবপুর এলাকায় একটা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল বা রাস্তার ধারে তাদের স্বেচ্ছায় জল ও খাদ্য সরবরাহরত ছিল এবং তারা ছিল নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক। তারা জানান, বহু বছর ধরে নিয়মিতভাবে রামনবমীতে এ ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। তারা আরও বলেছে যে ছাদে ভারী পাথর জড়ো করা হয়েছিল এবং মিছিল যাওয়ার মুহূর্তে মিছিলের ও পাশাপাশি উপস্থিত অন্যান্যদের উপর ভারী পাথর ছোঁড়া শুরু হয়েছিল, তাদের সন্দেহ তা ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং গোপন আস্তানা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। উলটোদিকে পুলিশ কোনোভাবেই ব্যবস্থা নেয়নি। যখন বাসিন্দারা তাদের গেট বন্ধ করা সোসাইটির দিকে চলে যায় তখন হুমকি হিংস্রতা অব্যাহত ছিল, যার ফলে নারী, শিশু এবং নীচু তলার পুলিশ কর্মকর্তা-সহ শান্তিপূর্ণ বাসিন্দাদের আহত করা হয়েছিল পাশাপাশি সম্পত্তির ক্ষতিও করা হয়েছিল।'

১৫। রিপোর্ট থেকে উদ্ভূত সবচেয়ে চমকপ্রদ বিবরণগুলির মধ্যে আর একটা হলো দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ দরজা বন্ধ করে থাকা নিরীহ হিন্দুদের উপর টিয়ার গ্যাস চালিয়ে লাঠিচার্জ করেছিল। ভুক্তভোগী এক ব্যক্তি কমিটির কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে এটা দেখা গেছে যে পুলিশ তাদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জনতা জড়ো হয়ে এলাকায় হিংসা শুরু করেছিল। ক্ষয়ক্ষতির জন্য তারা সেই আবাসনেও প্রবেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভুক্তভোগীরা তাদের দাবির সমর্থনে ভিডিয়ো জমা দেবেন। ভুক্তভোগীরা আরও প্রকাশ করেছে যে হিংসাকবলিত এলাকা থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে পুলিশ-থানা থাকা সত্ত্বেও যখন মুসলমান জনতা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছিল তখন পুলিশ আক্রান্ত হিন্দুদের আকুল আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

১৬। ভুক্তভোগীরা কমিটিকে জানিয়েছে যে তারা রাজ্য সরকারের হাতেই যখন তখন নিপীড়িত হওয়ার ভয় পাচ্ছিল। 'ভুক্তভোগীদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে। তারা এখনও অস্থির সময়ের তাজা পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে যার মধ্যে রয়েছে যে রাজ্য পুলিশ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতিতে পালিয়েছিল যে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মুসলমান জনতার আক্রমণে পরিণত হয়েছিল।'

১৭। **সর্বশেষে কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসে :**

(১) দাঙ্গাবাজ এবং তাদের সমর্থনকারীরা সরকারিযন্ত্রের সক্রিয় সমর্থনে কাজ করেছিল।

(২) রাজ্য সরকারের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া ক্ষতি এত ব্যাপক হতে পারত না।

(৩) প্রমাণগুলি পুলিশের সক্রিয় ভূমিকাকে নির্দেশ করে যা হিংসা চালিয়ে যেতে দেয়।

(৪) গত বছরও হিংস্রতা দেখা গিয়েছিল এমন একটা এলাকা থেকে অক্রমণ করার বিষয়ে পুলিশ অবগত ছিল কিন্তু হিন্দুদের অনুরোধের পরও তারা নিরাপত্তা দেয়নি তা প্রমাণ করে তাদের ভূমিকা।

৫। একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তোষণ করে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে রাজনৈতিক প্রভুরা রাজ্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল।

কমিটি তাদের প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত দাবিগুলি তুলে ধরে :

(১) দাঙ্গার নেপথ্যের দোষীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে যথাযথ পুলিশি ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়।

(২) দাঙ্গার তদন্ত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে জাতীয় তদন্ত কর্তৃপক্ষ (এনআইএ)-এর কাছে হস্তান্তর করা হোক।

(৩) ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা দিন যারা মৃত্যুভয়ের মধ্যে বাস করছে।

(৪) নির্দোষ ভিকটিমদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

(৫) জনগণ পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বলে আস্থা তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ বাড়ানো।

দেশে ক্রীড়া পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ।। শুধু অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তি, অবস্থান একটি দেশ তথা জাতিকে মহান করে তুলতে পারে না। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রীড়া এমনই একটি ক্ষেত্র যা সমগ্র বিশ্বের কাছে কোনো দেশের উন্নত অবস্থান, সংগঠিত পরিকাঠামোর চিত্র উপস্থাপন করে। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ১২টি বিষয় নিয়ে খেলো ইন্ডিয়া স্কিম চালু করা হয়েছিল।

সংশোধিত খেলো ইন্ডিয়া স্কিমে আরও পাঁচটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যা তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। খোলো ইন্ডিয়া স্কিমের জন্য ২০২১-২২ সালের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৬৫৭.৭১ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১০৪৫ কোটি টাকা।

খেলো ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য প্রকল্প থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ভারতীয় খেলোয়াড়রা অলিম্পিক, কমনওয়েলথ ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বস্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের অবস্থান উন্নত হয়েছে। এখন ক্রীড়াজগতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আধিপত্য বেড়েছে এবং ভারতীয় ক্রীড়ার এক নতুন পরিচয় তৈরি হচ্ছে। দেশের খেলোয়াড়রা এখন আরও বেশি সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছেন। ২০১৪ সালে কোনো আন্তর্জাতিক স্তরের খেলায় ভারতের ১০০ জনেরও কম খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতেন যা এখন বেড়ে ৩০০-রও বেশি হয়েছে। খেলায় সংখ্যায়ও ২০-২৫ থেকে বেড়ে ৪০-এর উপরে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমাদের দেশের নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করতে এবং তাঁদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিতে প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে।

দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতি, খেলার পরিধি সম্প্রসারিত করার জন্য খেলো ইন্ডিয়া অভিযান থেকে অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম চালু করা হয়েছে। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিভা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা সরকারের অগ্রাধিকারে রয়েছে। খেলোয়াড়রা যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করতে খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্রে ৪৬৪ জন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়কে কোচ ও পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যে সমস্ত খেলোয়াড় সারাজীবন দেশের জন্য পরিশ্রম করেছেন তাঁরা যেন অবসরের পরে কষ্ট না পান, তা নিশ্চিত করা।

খেলো ইন্ডিয়া অভিযানে নির্বাচিত তরুণ ক্রীড়াবিদদের প্রতি বছর ৬.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হয়। প্রথম খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'এই দিনটি শুধু একটি টুর্নামেন্টের সূচনা নয়, ভারতের ক্রীড়া আন্দোলনের সূচনা।' খেলো ইন্ডিয়া প্রাথমিকভাবে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য একটি দেশব্যাপী প্রচারাভিযান ছিল যা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে।

জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান পাঠ হলো পরাজয় স্বীকার করা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। মানসিক দৃঢ়তা, নেতৃত্ব এবং ঝুঁকি নেওয়ার আত্মবিশ্বাস মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই চেতনা নিয়ে ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল 'খেলো ইন্ডিয়া স্কিম' চালু করা হয়েছিল। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে খেলাধুলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, খেলোয়াড়দের সুবিধার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলায় বা খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

খেলো ইন্ডিয়ার প্রতিটি স্তরে খেলোয়াড়দের সাহায্যে গত পাঁচবছরে ১৩,১৩৫ জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় উপকৃত হয়েছেন। ৪৯১টি জেলায় ৭৩৩টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে ১২ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে ২৫ হাজার খেলোয়াড় এবং খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে ৭০৬০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই স্কিমের সূচনা থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৯৭টি ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ২৩৬টিরও বেশি ক্রীড়া অ্যাকাডেমি সহায়তার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। ২১টি জেলায় খেলো ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্টের অধীনে ২৮৪১ জন ক্রীড়াবিদকে খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলেট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০২৪-২৬ সাল পর্যন্ত খেলো ইন্ডিয়া বাজেটে ৩২০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশীয় ও আঞ্চলিক খেলাধুলার প্রসার ঘটেছে। ভারোত্তোলক জেরেমি লালনিনুঙ্গা, শুটার মনু ভাকের, সৌরভ চৌধুরী, সাঁতারু শ্রীহরি নটরাজ, অভিনব সাউ, ফিলিপ মহেশ্বরন তাবিথা, স্বদেশ মণ্ডল এবং আরও বহু ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। □

সংস্কৃতি-জগতের তিন প্রতিভাময়ী

শিপ্রা মিত্র

রূপশ্রী দত্ত

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের কথা ভাবলেই মনে পড়ে শিপ্রা দেবীর কথা। তাঁর জন্ম ৩০ মাচ, ১৯৩০ সাল। তাঁর পিতা অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় রেলদপ্তরের কর্মচারী। তাঁর শিশুকাল কেটেছে বিহারের কাটিহারে। সাত-আট বছর বয়সেই তিনি কাঁচরাপাড়ায় এলেন। ছোটো থেকেই তাঁর অভিনয়ে ঝোঁক ছিল। তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো'র অভিনয়ে যোগ দিলেন। সংগীতেও তাঁর ঝোঁক ছিল। 'সেনোলা' কোম্পানি থেকে প্রথম তাঁর রেকর্ড বেরোয়। সে গানের সংগীত পরিচালক ছিলেন সুকৃতি সেন। সেটা ১৯৪৪ সাল। 'দেবদাস', 'চিররকুমার সভা', 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে তিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গানও গেয়েছিলেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রে যোগদানের আগে তাঁর নাম ছিল কাননিকা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে কিংবদন্তী অভিনয় শিল্পী কানন দেবীর সঙ্গে নাম সাদৃশ্যের জন্য পর্দায় তাঁর নাম হলো শিপ্রা দেবী। কালোছায়া', 'রংবেরঙ', 'উল্টোরথ', 'কুয়াশা' ইত্যাদি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

১৯৫৪ সালে তিনি 'দূরভাষিণী' নাটকে কমলার ভূমিকায় রঙমহলে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নাটকে নায়িকা রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে 'রঙমহলে' 'সাহেব বিবি গোলাম'-এ ছিলেন নায়িকা পটেশ্বরীর ভূমিকায়। তাঁর সংগীতে দর্শকেরা আপ্লুত হতো।

এরপর তিনি যোগ দিয়েছিলেন কানন দেবীর 'মহিলা শিল্পী সংসদ' ও মলিনা দেবীর 'এম.জি. এন্টারপ্রাইজ' সঙ্ঘে।

শিপ্রাদেবী বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা শিশির মিত্রকে। পরবর্তীকালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। অবশেষে ২৩ মে, ২০০৯ সালে পুত্র ও পুত্রবধূকে রেখে তিনি মারা যান।

সুমিত্রা দেবী আর এক নিপুণ অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৩ সালে। মৃত্যু ১৯৯০ সালে। তিনি অভিনয় করেছিলেন 'গড়ের মাঠ', 'আঁধারে আলো', 'যৌতুক' 'সন্ধি' (১৯৪৪), 'সমর' (১৯৫০), 'দস্যু মোহন' (১৯৫৫)। পিতা মুরলী চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দেবী মুখোপাধ্যায়।

অন্যতমা আর এক অভিনেত্রী হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে কুমিল্লাতে। পিতা শশধর চট্টোপাধ্যায়।

তিনি 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছিলেন। সংগীত, নাটক অ্যাকাডেমি ও পুরসভায় নাটকের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি টালিগঞ্জে তাঁর দিদির বাড়িতে থাকতেন। সে সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছে। দশ বছর বয়সে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর

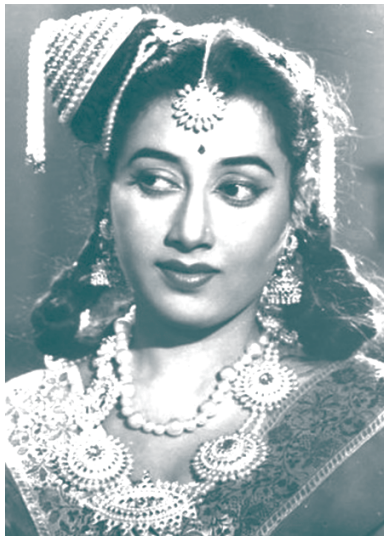

সুমিত্রা দেবী

যোগাযোগ হয় এবং তিনি 'নতুন ইহুদী' ছবিতে অবতীর্ণ হন। পরিচালক ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তমকুমারের সঙ্গে 'সহযাত্রী' (১৯৫১), 'পাশের বাড়ী' (১৯৫২) 'লাখটাকা' (১৯৫৩) 'রাইকমল' (১৯৫৫) ইত্যাদি ছবিতে তনি অভিনয় করেছিলেন।

মেমোরি রিচার্জ

যার যত বুদ্ধি, সে তত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যার বুদ্ধি একটু কম সে কী করবে? যে কি সবসময় পিছিয়ে থাকবে? না, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কোনো ওষুধ ব্যবহার করে বুদ্ধি বাড়ানো যায় না। যার যতটুকু ক্ষমতা তার ওপর কিছু সোশ্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, ট্রেনিং, স্পেশ্যাল এডুকেশন বা অকুপেশনাল থেরাপি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। মেমোরিকে একটু শান দেওয়ার জন্যই কিছু পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঃ প্রথমেই মনে রাখতে হবে, ওভার ওয়েট হলে চলবে না। ওভার ওয়েট হলে শরীরে রক্ত সঞ্চালনার কাজটি কঠিন হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কে ঠিকমতো রক্ত না পৌঁছলে ব্রেন ঠিকমতো কাজই করতে পারবে না। রোজ জোর কদমে হাঁটা, সাঁতার কাটা বা দৌড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন।

মস্তিষ্কের শত্রু ঃ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো রাগ আর উদ্বেগ। এরা মস্তিষ্ককে ক্ষয় করে। কোনো কিছুতে মন বসাতে দেয় না। স্মৃতিধারণ করার ক্ষমতা দুর্বল করে। যদি মাল্টিটাস্কিং করলে স্ট্রেস বাড়ে, তবে সেটা না করাই ভালো। রাগ ও উদ্বেগ থেকে দূরে থাকবে হবে।

অবসাদ দূর করা ঃ মনে যদি কোনো অবসাদ থাকে তাহলে সেটাকে যেভাবেই হোক দূর করতে হবে। প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাইকোলজিস্টের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

মস্তিষ্কে তথ্য সাজানো ঃ সারাদিন কেউ প্রচুর পড়াশোনা করল, তারপর বইপত্র, খাতা-কলম সব অগোছালো হয়ে টেবিলে পড়ে রইল, রাতে ঘুমিয়ে পড়লে মা এসে পড়ার জায়গাটি গুছিয়ে আবার সুন্দর করে দেন। মস্তিষ্কের ব্যাপারটিও সেই রকম। আমরা সারাদিন যত তথ্য সংগ্রহ করি না কেন, না ঘুমোলে ব্রেন সেগুলিকে সাজিয়ে রাখতে পারে না। জিনিসপত্র গুছানো না থাকলে কী অসুবিধা? অসুবিধা একটাই— সেটিকে আর প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিকমতো ঘুম না হলে মস্তিষ্কও তথ্য হারিয়ে ফেলে, ফলে আমরা প্রয়োজনে

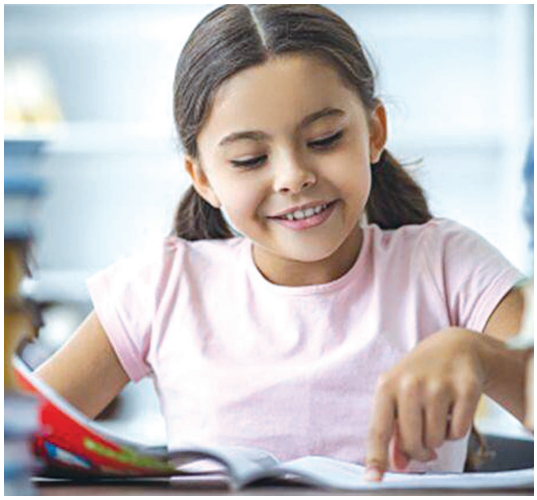

সেসব আর মনে করতে পারি না। অতিরিক্ত রাত জেগে পড়লে অনেকেই পরীক্ষার হলে বসে পড়া ভুলে যায়। তাই রাতে সাত-আট ঘণ্টা ঘুম, সঙ্গে সারাদিনে ফাঁকে ফাঁকে ১০-১৫ মিনিট ঘুমিয়ে নিলেও মেমোরি রিচার্জ হয়, ক্লান্তি কেটে যায়।

লিখে রাখা ঃ যা মনে রাখতে হবে তা সঙ্গে সঙ্গে কোথাও লিখে রাখতে হবে। কোনো কিছু লিখে রাখার সময় মস্তিষ্কের ধারক অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয়। ফলে মস্তিষ্ক সহজেই তা মনে রাখে। স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য রোজ ডায়েরি লেখার অভ্যাস করা বেশ কার্যকরী।

মিউজিক শোনা ঃ মিউজিক মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ক্ষমতা বাড়ায়। কোনো কিছু শেখার সময় যদি একটা হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থাকে, তাহলে মস্তিষ্ক ওই মিউজিকটির সঙ্গে স্মৃতিশক্তিকেও সংযুক্ত করে নেয়।

মস্তিষ্কের খাদ্য ঃ মস্তিষ্কের ৫০-৬০ শতাংশ কোষই হলো ফ্যাট সেল এবং তারা স্নায়ুকোষগুলিকে ইনসুলেশন দেয়। সুতরাং তাদের কার্যকারিতা বজায় রাখতে ফ্যাটজাতীয় খাবার খাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

ছবি দেখে পড়া ঃ আমরা যে বিষয়টি পড়ছি তার সঙ্গে যদি কিছু ছবি বা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম থাকে বা কোনো টেবিল তাহলে সেটা মনে রাখা সহজ হয়। তা যদি না থাকে তবে নিজের মতো এঁকে নিতে হবে। আঁকার মতো কিছু না পেলে পয়েন্ট করে ফ্লো চার্ট করে নিলেও মনে রাখতে সুবিধা হবে। হাসির ছবি দেখা যেতে পারে, হাসির বই পড়া যেতে পারে এবং সুযোগ পেলেই মন খুলে হাসতে হবে। হাসলে ব্রেনের স্ট্রেস রিলিফ হয়, শর্ট টার্ম মেমোরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ব্রেনকে চ্যালেঞ্জ করো ঃ জটিল সমস্যার সমাধান করলে ব্রেনের পুষ্টি হয়। কোনো গল্প পড়লে বা সিনেমা দেখলে, সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো, ওটা অন্যরকম হলে কী হতো? শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তাই ভাবনাচিন্তা না করে মাথাটি শয়তানকে লিজ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পরিবর্তন ঃ তোমার চোখ রোজ যা দেখছে তা বদলে ফেলো। মানে দুদিন অন্তর তোমার পড়ার টেবিল অন্যভাবে সাজাও। রোজ যে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরো, তিনদিন পর অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরো। এতে মেমোরি শক্তিশালী হবে।

পড়ার এক্সারসাইজ ঃ কোনো কিছু পড়ার সময় সব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করো। যেমন ধরো, তুমি পড়ছ। মনে মনে পড়লে শুধু তোমার মাথা আর চোখ করছে। সেখানে চেঁচিয়ে বা শব্দ করে পড়লে চোখ, কান, মাথা সবাই অংশ নেয়। ফলে পড়া বেশি মনে থাকে।

এভাবেই চেষ্টা চালিয়ে মেমোরিকে রিচার্জ করে শক্তিশালী করে তোলো, তাতে আখেরে লাভ কিন্তু তোমারই।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

তিলকা মাঝি

তিলকা মাঝি বা তিলকা মুরমু ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জ থানার তিলকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩০০ জন সাঁওতাল যোদ্ধা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রামগড় ব্যাটালিয়ান কবজা করে নেন এবং কোম্পানির ট্রেজারি লুঠ করে গরিব মানুষদের বিলিয়ে দেন। বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে বেঁধে দিয়ে আধমরা করে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ভাগলপুর শহরে তাঁকে যেখানে হত্যা করা হয় সেখানে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে । তাঁর সম্মানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় **তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়।**

জানো কি?

- মোবাইল ফোনের জনক মার্টিন কুপার।
- সর্বপ্রথম জাপানে মোবাইল ফোন চালু হয়।
- Mobile = M--Modified, O--Operation, B--Byte, I--Intergration, L -- Limited, E--Energy.
- Touch Screen প্রথম চালু করা কোম্পানি হলো IBM Simo (1992) ।
- ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মোবাইল ফোনের SAR (Specific Absorption Rate) value সর্বোচ্চ হওয়া উচিত 1.6E/kg.

ভালো কথা

নরেন্দ্রপুরে দুই বছর

আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমি এখানে ভর্তি হই পঞ্চম শ্রেণীতে। অবশ্যই অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে। প্রথম প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে মন খুব খারাপ করছিল। কিন্তু আমি মনকে শক্ত করে রাখি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হলো আমাদের নরেন্দ্রপুরের জীবন যেটাকে আমরা 'নরেন্দ্রপুরের ঘণ্টাময় জীবন' বলে জানি। এখানে সকলকেই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটি সুন্দর রুটিন মানতে হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি একেবারে আশ্রমের মতো। চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা। এখানে পড়াশোনা ছাড়াও নানা ধরনের কো-ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের খেলাধুলারও সুব্যবস্থা আছে। এখানকার শিক্ষক মহারাজরা আমাদের সবসময় স্নেহভরে দেখাশোনা করেন। এই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

উদিত দত্ত, ষষ্ঠশ্রেণী, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল ত্রা দো

(২) মি নি ধা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) হ্ব বি ক র য় দ দা

(২) হা সি ন ং স ত চ্যু

১৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) তদারকি (২) নাতবউ

১৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) কিচিরমিচির (২) টাপুরটুপুর

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রামনগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৮ পরগনা। (২) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪ (৩) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (৪) সুকর্ণা দেব, দুর্গাবাড়ি, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

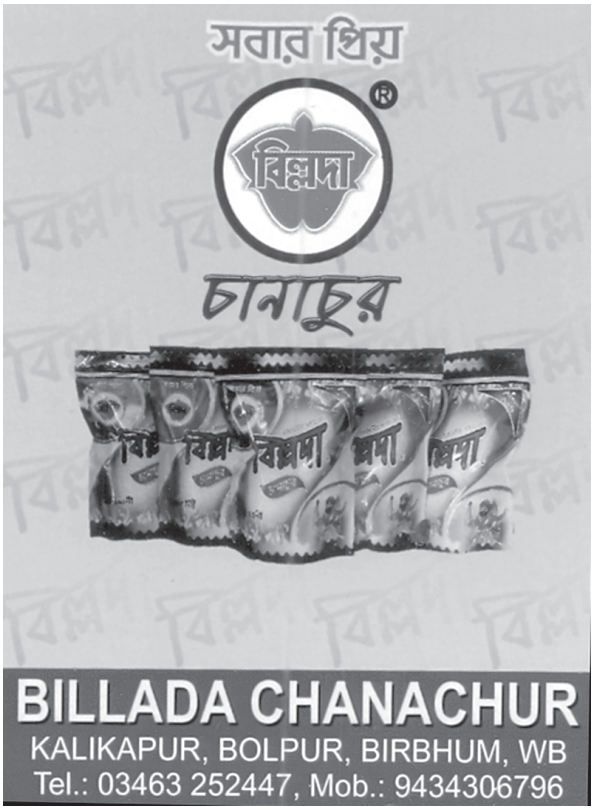

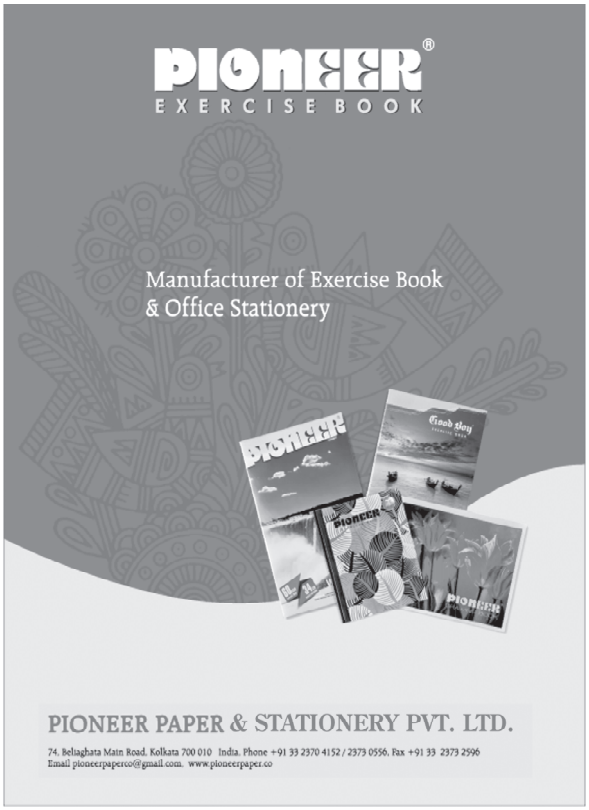

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অমরনাথের পথে

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সালটা ১৯৭৫, আগস্ট মাস। তখন দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে কর্মরত ছিলাম। ইস্পাত নগরীতে থাকতাম। একদিন আমার এক বন্ধু এসে বলল অমরনাথ যাবেন? পাহাড় সম্পর্কে আমার জ্ঞান তখনও পর্যন্ত পরেশনাথ পর্যন্ত। ধানবাদ, গোমো ছাড়িয়ে আর একটুখানি। অবশ্য বাঁকুড়াতে শুশুনিয়া পাহাড় আর পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ের নাম শুনেছিলাম তবে দেখা হয়ে ওঠেনি। একবার শিমূলতলা গিয়েছিলাম। সেখানে লাটু পাহাড় আর ছাতু পাহাড়ে উঠেছিলাম। তাই বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম তা আপনার অমরনাথটা কোথায়? পরেশনাথের কাছাকাছি নাকি? বন্ধু একটু হেসে বলল, 'আর একটু দূরে, কাশ্মীরে'। শুনে অবশ্য মনটা নেচে উঠল। কাশ্মীর সে তো ভারতের সুইজারল্যান্ড! বন্ধুর কাছ থেকে যাত্রাপথের বিবরণ পেলাম। প্রথমে ট্রেনে চেপে জম্মু, সেখান থেকে বাসে করে শ্রীনগর। সেখানে একটা রাত কাটিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে বাসে করে পহেলগাঁও আর পহেলগাঁও থেকে পদব্রজে আমাদের আসল যাত্রা শুরু হবে অমরনাথের উদ্দেশে।

যাওয়া আসা মিলিয়ে ৯০ কিলোমিটার পথ পদব্রজে। অবশ্য টাট্টু ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায় মাল বহন বা যাত্রী বহন করার জন্য। আমার বন্ধু এর আগে গোমুখ ভ্রমণ করে এসেছে। কাজেই একটু স্পিরিটেড। আমিও মনে মনে বললাম 'হম কিসিসে কম নেহি'। তাই রাজি হয়ে গেলাম। তখনকার দিনে কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস এত ছিল না। সরকারি বাধানিষেধ, কড়াকড়িও এত ছিল না। যাত্রা সংখ্যাও অনেক কম ছিল। তবে সময়টা সম্ভবত জুলাই আগস্ট মাসের মধ্যে। তারপর যাত্রা বন্ধ থাকত। যাইহোক, আমি সম্মতি জানিয়ে ট্রেনের টিকেট রিজারভেশন ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম। বন্ধু জানালো পাহাড়ে হিমবাহের ওপর দিয়ে অর্থাৎ বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। চামড়ার জুতো সেখানে চলবে না। তখন বাটাতে পাওয়া যেত হান্টিং শু, এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না। ৯০ কিলোমিটার রাস্তায় হোটেল বা চটি কিছু পাওয়া যাবে না। রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ভাড়া করতে হবে। আর রান্না করার জন্য জনতা স্টোভ, কেরোসিন, দেশলাই, প্রেসার কুকার, চাল, ডাল, ছাতু, চিড়ে ইত্যাদি সঙ্গে নেওয়া হলো। মনে মনে ভাবছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ যখন গিয়েছিলেন তখন তো এসব প্রেসার কুকার, জনতা স্টোভ ইত্যাদি ছিল না। তাহলে স্বামীজী কী করতেন?

দুর্গাপুরে বি-জোনে শোভাপুর নামে একটা জায়গা ছিল, হয়তো এখনও আছে। আমরা বলতাম 'মালাবার হিলস অব দুর্গাপুর। আমরা সেখানে চড়াই উতরাই অভ্যাস করা শুরু করে দিলাম। যত দিন যাচ্ছে আমাদের উৎসাহ ততই যেন টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করছে। অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ যাত্রার দিন উপস্থিত। আমরা চার বন্ধু যাব। দুর্গাপুর রেলস্টেশনে জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে জম্মুর উদ্দেশে রওনা দিলাম চার জন। ট্রেনে ২ দিন ২ রাত কাটাতে হবে। দ্বিতীয় রাতের ভোরের দিকে হঠাৎ যাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যস্ততা দেখা গেল। ট্রেন থেমে রয়েছে পাঠানকোট স্টেশনে। ট্রেন আর যাবে না। লাইনে কোথায় যেন ফাটল দেখা গেছে। তাহলে উপায়? শোনা গেল পাঠানকোট থেকে বাসে করে জম্মু যেতে হবে। অগত্যা মধুসূদন। ট্রেন থেকে তাড়াহুড়ো করে নেমে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাসে ওঠা গেল। গন্তব্যস্থল জম্মু। শুনলাম ৮-১০ ঘণ্টা লাগবে। জম্মুতে পৌঁছনো গেল বিকেলের দিকে।

তখনকার দিনে অটো, টোটো এসব ছিল না। শুনলাম শ্রীনগরের বাস ছাড়ে সকালবেলায় আর শ্রীনগর পৌঁছয় সন্ধ্যেবেলায়। মোটামুটিভাবে ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা। তাই স্থির হলো রাতটা জম্মু টুরিস্ট লজে কাটিয়ে পরদিন সকালে শ্রীনগরের বাস ধরা হবে। তাই করা হলো। তবে জম্মু ছাড়িয়ে বাস শ্রীনগরের রাস্তা ধরতেই মনটা জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা কখনও পাহাড়ের মাথায়, কখনও-বা পাহাড়ের নীচে। রাস্তার ধারে ধারে ডালিম গাছ, অজস্র লালচে ডালিম ধরে আছে। এক সময় বানিহাল টানেলে বাস ঢুকলো, খানিকক্ষণ বাদে বেরিয়েও এল। সন্ধ্যেবেলায় বাস শ্রীনগর পৌঁছল। রাতটা টুরিস্ট ব্যুরোতে কাটিয়ে সকালবেলা ওখান থেকেই পহেলগাঁওয়ের বাস ধরে দুপুর নাগাদ পহেলগাঁও পৌঁছে গেলাম। রাতটা পহেলগাঁওয়ে কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা আমাদের আসল যাত্রা শুরু হলো।

ইতিমধ্যে একটা ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে নিজেদের সামান্য জিনিসপত্র যা না নিলেই নয় সেগুলিই নিলাম। প্রথম গন্তব্যস্থল চন্দনওয়াড়ি, পহেলগাঁও থেকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে। পাহাড়ি রাস্তা। একদিকে খাড়া পাহাড় বন জঙ্গলে ঢাকা। অন্যপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী লিডার নদী। সবে চলা শুরু

ফঃ ৬

হয়েছে, মনটা ফুরফুরে। ঠিক হয়েছিল চন্দনওয়াড়িতেই মধ্যাহ্নভোজন করে নেওয়া হবে। ওখানে নাকি রুটি ডাল ভাতের হোটেল আছে। তাই হলো, ওখানে মধ্যাহ্নভোজন করে একটু বিশ্রাম তারপর আবার চলা। ২-৩ কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা হিমবাহ অর্থাৎ গ্লেসিয়ার পড়ল। তবে এটা খুব সুখপ্রদ ছিল না। সম্ভবত ১ বা ২ কিলোমিটার তারপর শুরু হলো পিসুটপের চড়াই উতরাই, খানিকটা উঠে বেঁকে যাচ্ছে। আমরা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে দেখছি রাস্তাটা খানিকটা ওপরে উঠে আবার বেঁকে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। ভাবছি এটা বোধহয় শেষ চড়াই। আবার সেটা ওপরে খানিকটা উঠেই আবার বেঁকে গিয়ে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রতিবারই ভাবছি এটাই বোধহয় শেষ চড়াই। ততক্ষণে পিসুটপের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি। তখন একবার নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবছি ফিরে যাব কিনা? আবার ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখছি আর কতটা ওপরে উঠতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পুরো রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে না। একটু ওপরে উঠেই রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে ঝোপজঙ্গলে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে, পাকদণ্ডী যাকে বলে আর কী। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়ে গেছে কিন্তু জলের বোতল তো ঘোড়ার পিঠে। ধারে কাছে কেউ নেই। তবে লক্ষ্য করলাম পাশেই একটা সরু ঝরনার ধারা নেমে যাচ্ছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের ধারা। কী আর করা। ওই জল আঁজলা ভরে নিয়ে পান করলাম। শান্তি হলো। আবার ওপরে উঠতে শুরু করলাম।

এরপর ১৫-২০ হাত যাওয়ার পর যা দেখলাম তাতে গা ঘিন ঘিন করে উঠল। ওই জলধারার পাশেই কেউ একজন পায়খানা করে রেখেছে। নিশ্চয় ওই জলধারাতেই সে শৌচকর্ম করেছে। কিছু করার নেই। মনকে প্রবোধ দিলাম সেই নোংরা জল তো আর সেখানে নেই, নীচে চলে গেছে। আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। তার কিছুক্ষণ পর চড়াইয়ের শেষ মাথাটা দেখা গেল। আমার সহযাত্রী বন্ধুদের একজনকে দেখা গেল চড়াইয়ের একেবারে শেষ মাথায়। আর কাউকে দেখা গেল না। চড়াই অতিক্রম করেই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। একটু ধাতস্থ হয়েই দেখি আমাদের দুই সহযাত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে আসতে পথেই শুয়ে পড়ল। চড়াই অতিক্রম করেই দেখেছিলাম ওপরেই একটা ঝুপড়ি মতো চায়ের দোকান। সেখানে কয়েকজন বসে চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখে হিন্দি মিশ্রিত ভাষায় বলল আমাদের সহযাত্রী বন্ধু যারা রাস্তায় শুয়ে পড়েছিল তাদের ওখান থেকে সরে আসতে, কারণ সেখানে আরও ওপর থেকে ছোটো ছোটো পাথর পড়ছে। একটা পাথর মাথায় পড়লেই 'খেল খতম' হয়ে যাবে। যারা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছিল তাদেরই অনুরোধ করলাম ওদের ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে। আমরা অবশ্যই পারিশ্রমিক দেব। তারা রাজি হয়ে গেল তখনই। আর তারা সঙ্গে সঙ্গেই একটু নীচে নেমে ওদের দুজনকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে এল।

গ্রামবাসী কাশ্মীরি মুসলমানরা খুবই শান্ত ও নিরীহ, তবে গোঁড়া মুসলমান। ফোটো তোলানো ওদের কাছে খুবই গর্হিত। গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা অমরনাথ যাত্রীদের দেখলেই 'শেঠজী পইসা দিজিয়ে বলে ঘিরে দাঁড়াতো। আমরাও চার আনা আট আনা ওদের দিয়ে দিতাম। একবার ওদের দলের সঙ্গেই থাকা কাশ্মীরি পোশাক পরা ৮-৯ বছরের একটা মেয়ের ফোটো তোলার উপক্রম করতেই বাচ্চা মেয়েটা ত্রস্তা হরিণীর মতো শিউরে উঠে পালিয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম ফোটো তোলানোটা ওদের কাছে অপরাধ। এরপরে অবশ্য শেষনাগের পথে একটা মুদির দোকানে কিছু কিনতে আসা দুটি কাশ্মীরি মেয়ের ফোটো তুলেছিলাম ৫-১০ টাকা দেবার প্রলোভন দেখিয়ে। মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা ২-১ জনের মন্তব্য শুনতে পেলাম, মেয়ে দুটিকে বলছে 'টাকার বিনিময়ে ইজ্জত বেচে দিলি? এখনকার সময় হলে হয়তো আমাদের লাশ পড়ে থাকত। যাইহোক, সেই চা খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। গন্তব্যস্থল শেষনাগ। এখন রাস্তাটা অনেকটাই ভালো। চড়াই উতরাই নেই। তাই একটু জোরকদমে হাঁটা শুরু করলাম। ৮-১০ কিলোমিটার পথ যেতে হবে। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে নয়তো পথ হারানোর খুবই সম্ভাবনা। চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। একদিকে জঙ্গলে ঢাকা উচ্চ পর্বত শ্রেণী।

অন্যদিকে কিছুটা নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা লিডার নদী। দূরে চারদিকে বরফাবৃত পর্বতশ্রেণী। মাঝে মাঝেই মেষপালকদের মেষ চরাতে দেখা যাচ্ছে। এক একজন মেষপালককে দেড়শো দুশো মেষ চরাতে দেখলাম। কীভাবে হিসেব রাখে কে জানে? মাঝে মাঝে অমরনাথ ফেরত যাত্রীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন করলেই চটজলদি উত্তর মিলছে 'যাইয়ে না থোরাসা বাকি হ্যায়' মাঝে মাঝে বিদেশি পর্যটকদেরও দেখা যাচ্ছে। তাদের অনেকেই হাত তুলে নমস্কার করছে। চারদিকের পরিবেশ এত মনোরম যে পথের ক্লান্তি গায়ে লাগছে না। এর মধ্যেই মাঝে মাঝে দু চারটে মালবাহক মাথায় পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে হুসহাস করে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে আমাদের পদযুগল তো এগুতেই নারাজ। শেষ পর্যন্ত শেষনাগে পৌঁছানো গেল। খুবই একটা সুখবর পেলাম। দু' একজন পঞ্জাবি, গুজরাটি সে বছরই প্রথম দু একটা পান্থশালা খুলেছে অমরনাথ যাত্রীদের থাকা খাওয়ার জন্য, অবশ্যই মূল্যের বিনিময়ে। আমাদের নিজেদের আর তাঁবু খাটাতে বা রান্না করতে হবে না, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরে। একটা তাঁবু ভাড়া নিয়ে মালপত্র রাখা হলো।

শেষনাগ হ্রদ একটা পাহাড়ের ওপরে। অর্ধেকটা ঢাকা রয়েছে বরফে। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা শীর্ণ জলধারা বলা ভালো বরফধারা ওপর থেকে নেমে হ্রদে মিশেছে আর এই শেষনাগ হ্রদটাই হলো লিডার নদীর উৎপত্তিস্থল। খুবই আশ্চর্যের, দেখলাম আরও নীচে হ্রদের জলের খুব কাছেই তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে এক বিদেশি দম্পতি, সম্ভবত, যাতে অন্যরা তাদের বিরক্ত না করে। আমরা তো সর্দারজীর দোকানে রুটি তরকা খেয়ে কম্বলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পরের দিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সঙ্গের ব্যাগ গুছিয়ে ঘোড়ার পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে সর্দারজীর দোকানে চা রুটি খেয়ে রওয়ানা দিলাম পঞ্চতরণীর উদ্দেশে। ঘোড়াওয়ালা

খুব ভালো। আমাদের দুই সঙ্গী জানাল তারা আর হাঁটতে পারছে না। তখন ঘোড়াওয়ালাটা দুটো ঘোড়া জুটিয়ে আনল। আসলে ঘোড়াওয়ালারা জানে মাঝ রাস্তায় অনেক যাত্রীই কাহিল হয়ে পড়বে। তাই অনেক ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া নিয়ে শেষনাগে অপেক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায়। সহযাত্রী বন্ধু দুজনকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা করিয়ে আমরা দুই বন্ধু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগুতে শুরু করলাম। এবার পুরোটা হিমবাহ। বরফ ঠুকে ঠুকে এগুচ্ছি। মাঝে মাঝে কল কল শব্দ শুনতে পাচ্ছি অর্থাৎ পায়ের নীচে কোনও জলপ্রবাহ রয়েছে। মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে বরফ ঠুকে ঠুকে দেখছি আমাদের ওজন নিতে পারছে কিনা। বরফ ভেঙে যদি একবার নীচে পড়ে যাই তাহলে জলস্রোতে কোথায় গিয়ে আটকে থাকব কেউ বলতে পারবে না। রাস্তা বলে কিছু নেই। চারদিকে শুধু বরফের চাদর। আমরা অগ্রবর্তী কারও পদচিহ্ন ধরে ধরে অতি সাবধানে এগুচ্ছি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ চারদিক কালো হয়ে গেল। শুরু হলো বৃষ্টি। সঙ্গে রেইন কোট ছিল। কিন্তু ব্যাগ থেকে বের করতে করতেই ভিজে একশা। আশ্রয় নেওয়ার কোনও কিছু নেই। হয় ঠাই দাঁড়িয়ে থাক নয়তো সামনে এগোও। নান্য পন্থা। আমরা এগুতেই থাকলাম। আমাদের মালবাহক তার ঘোড়া আর আমাদের ঘোড়সওয়ারি দুই বন্ধুকে আর দেখা যাচ্ছে না। এখন আমরা মহাগুনা পাসের ওপর দিয়ে চলেছি। উচ্চতা ১৮ হাজার ফুট। মনে মনে হিসেব করলাম মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯ হাজার ফুট। মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম 'হম কিসিসে কম নেহি'। কয়েক কিলোমিটার হাঁটার পর চড়াই উতরাই ভেঙে আমাদের শরীরে আর কিছু ছিল না। সঙ্গী বন্ধুকে বললাম এখন যদি একটা ভালুক এসে আক্রমণ করে আমরা কী করব? বন্ধু বলল, কিছুই করার নেই শুধু ভালুকের ভক্ষ্য হওয়া ছাড়া। মাঝে মাঝে খুব দুর্গন্ধ আসছিল। পথে কোনও ঘোড়া মারা পড়লে ওখানেই রেখে দেওয়া হয় রাস্তা থেকে একটু দূরে সরিয়ে। ওটাই পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। কারো কিছু করার থাকে না। এরপর বেশ কিছুটা দূর থেকে কয়েকটা সাদা তাঁবু চোখে পড়ল। শুনলাম ওইটাই পঞ্চতরণী। ওইখান দিয়ে পাঁচটা নদী প্রবাহিত হয়েছে। আমার চোখে নদী নয়, কয়েকটা খাল বা নালা চোখে পড়ল। একটা ছোটো সাঁকো পেরিয়ে তাঁবুগুলোর কাছে পৌঁছানো গেল। তাঁবুওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাঁবুতে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো আর পাহাড়ের গা বেয়ে হুড় হুড় করে জলস্রোত নামতে লাগল। তাঁবুওয়ালা তাঁবুগুলোর চারপাশ দিয়ে নালা কেটে রেখেছিল, ফলে জলস্রোত আর তাঁবুতে না ঢুকে তাঁবুর পাশ দিয়ে নীচে নেমে পঞ্চতরণীতে মিশে যাচ্ছিল। মিনিট ১৫-২০ পর বৃষ্টি থেমে গিয়ে চারদিক পরিষ্কার হয়ে ঝকঝকে নীলাকাশ দেখা দিল। অদ্ভুত ব্যাপার! এবার সঙ্গে করে নিয়ে আসা প্লাস্টিক সিট বিছিয়ে তার ওপর কম্বল পেতে সটান শুয়ে পড়া গেল। শরীর আর বইছে না। ঘণ্টা খানেক পর উঠে তাঁবুওয়ালার চটি থেকে ডাল রুটি খেয়ে আবার কম্বলের ভেতর। সারা রাত আর কোনও সাড় ছিল না।

পরদিন যথারীতি ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্দারজীর দোকানে চা রুটি খেয়ে, গলায় পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমে কিছুটা চড়াই তারপর অবশ্য মোটামুটি ভদ্র। পাহাড়ি এলাকায় এরকম রাস্তা পাওয়া যায় না সচরাচর। তবে বেশিক্ষণ নয়। আবার শুরু হলো এবড়ো খেবড়ো পায়ে চলার রাস্তা। রাস্তা না বলাই ভালো। পর্বতের ধার দিয়ে সরু পথ। পর্বতের অন্যদিকে সাদা বরফে ঢাকা। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর অনেক দূরে চোখে পড়ল পর্বতের গায়ে একটা খোঁদল মতো। শুনলাম ওইটাই অমরনাথ গুহা আমাদের গন্তব্যস্থল। শুনেই শরীরে শক্তি এসে গেল। এবার জোর কদমে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। তবে খুব সাবধানে। কারণ বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা। লাঠি ঠুকে ঠুকে বরফের স্তরটা কতটা শক্ত আমাদের ওজনটা সদ্য করতে পারে কিনা সেটা দেখে নিয়ে। একটুও অসতর্ক হওয়া চলবে না।

অবশেষে অমরনাথ গুহামুখে এসে পৌঁছলাম। এরপর আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা গেল। প্রথমটা অন্ধকার ঠেকলেও একটু পরে সহ্য হয়ে গেল। একদিকে বরফের শিবলিঙ্গ। আর অন্যদিকে অর্থাৎ বাঁদিকে পার্বতী। বরফের শিবলিঙ্গের সামনে হাত জোড় করে বসে রইলাম। একটু ঘোরাঘুরি করলাম। সে সময় আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করল ব্যানার্জিবাবু 'পায়রা দেখেছেন?' আমি বললাম, 'এত কষ্ট করে এখানে এলাম কি পায়রা দেখার জন্য? অবশ্য গুহার ওপরের দিকে একটা ঝটাপট শব্দ শুনে তাকিয়ে একটা বাদামি রঙের পায়রা দেখতে পেয়েছিলাম। গুহাটা বেশ বড়ো, একটা তিনতলা বাড়ির মতো। তবে স্যাঁতসেঁতে আর বেশ ঠাণ্ডা। গুহার ভেতরে বাঁদিকে তারের জালের মতো ছিল, ভক্তরা নিজেদের মনস্কামনা জানাতে কিছু লিখে রাখতেন কোনও কিছুর ওপর।

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার ফেরার পালা। বাইরে একটা জলাশয়ের মতো দেখলাম। ওই ঠাণ্ডায় অনেকে সেখানে স্নান করছে দেখলাম। চারদিকে কীরকম একটা শান্ত পরিবেশ। লোকজন রয়েছে কিন্তু কোলাহল নেই। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগল গুহাটার অমরনাথ নামকরণ নিয়ে। তখন সাধুবাবার মতো একজন একটা গল্প বললেন, মহাদেব একবার পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ওই পথে কৈলাশে ফিরছিলেন। কিন্তু পথশ্রমে পার্বতী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাঁরা ওই গুহায় প্রবেশ করেন। কিন্তু পার্বতী এতই ক্লান্ত ছিলেন যে তিনি পার্বতীকে একটি গল্প বলতে শুরু করেন। শিবঠাকুর আরও বলেন ওই গল্প শেষ পর্যন্ত যে শুনবে সে অমর হয়ে থাকবে। পার্বতী ওই গল্পটি শেষ পর্যন্ত শুনেছিলেন কী না সেটা জানা নেই, তবে ওই গুহায় বাস করা দুটি কবুতর গল্পটি শেষ পর্যন্ত শুনেছিল। তাই তাদের নামেই গুহাটির নামকরণ হয় অমরনাথ।

অমরনাথ দর্শন হলো। এবার আমাদের ফেরার পালা। শরীরে কিছুটা ক্লান্তি থাকলেও মনটা ছিল ফুরফুরে মেজাজের। চারপাশটা

এবার একবার ভালো করে দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে বেশ কিছুটা নামতে হবে। সময়টা ছিল অফ সিজন। তাই ভিড়ও তেমন ছিল না। আমরা প্রথমেই বাবা অমরনাথের এবং আরও কিছু ফোটো তুললাম। তখন তো এখনকার মতো মোবাইল ফোন বা ক্যামেরার এত রমরমা ছিল না। কাজেই খুব বুঝে শুনে ফিল্ম খরচ করতে হচ্ছিল। আমরা বাবা অমরনাথের উদ্দেশে একটা প্রণাম ঠুকে রওনা দিলাম। এখন ডবল উৎসাহ নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের দুই ঘোড়সওয়ার বন্ধু তো আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। যতটা মনে পড়ছে আমাদের মোটবাহক ঘোড়া সমেত পঞ্চতরণীতেই থেকে গিয়েছিল। আমরা হিমবাহের ওপর দিয়ে ঠুক ঠুক করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগুচ্ছি। কারণ বরফের স্তর খুবই পাতলা, কখন বরফ ভেঙে পা ভেতরে ঢুকে যাবে ঠিক নেই। আকাশ পরিষ্কার। চারদিক রোদে ঝকঝক করছে। বেশ কিছুটা এগোবার পর একটা ফাঁকা জায়গায় পাথরের ওপর কয়েকটা বাদামি রঙের পায়রা বসে থাকতে দেখলাম। আমার সহযাত্রী বন্ধুকে দেখালাম। আসলে পায়রাগুলি কাছাকাছি কোথাও থাকে। রাতে ঠাণ্ডা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে হয়তো গুহায় আশ্রয় নেয়।

সম্ভবত ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর পঞ্চতরণী পৌঁছলাম। সর্দারজীর চটিতে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের ঘোড়সওয়ার দুই সহযাত্রী আগেই পৌঁছে গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়েছিল। আমরাও খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঠিক করলাম আজই শেষনাগ ফিরে গিয়ে সেখানেই নিশিযাপন করব। তাহলে পরদিন সকালে রওনা দিলে সেদিন সন্ধ্যের দিকেই পহেলগাঁও পৌঁছতে পারব। তাই আবার পথ চলা শুরু করে দিলাম। আমাদের ঘোড়সওয়ার সহযাত্রী দুজন আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল তারা আগে আগেই পৌঁছে চটি অর্থাৎ হোটেল ঠিক করে রাখবে। কিছুটা চড়াই ভাঙার পর রাস্তাটা মোটামুটি ভদ্র। পরিষ্কার আকাশ, বরফাচ্ছাদিত শ্বেতশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ চতুর্দিকে। কিছুটা নীচে মেষপালকরা মেষ চরাচ্ছে। এক একজন মেষপালকের সঙ্গে দেড়শো দুশো মেষ। হিসেব রাখে কীভাবে কে জানে? কিছুক্ষণ পর সেই দুর্গন্ধময় জায়গাটা এসে গেল। নাকে রুমাল চাপা দিলে দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁটা যায় না। আবার নাক খোলা রাখলে দুর্গন্ধে টেকা মুশকিল। অতি কষ্টে স্থানটা অতিক্রম করা গেল। তারপর আবার সেই হিমবাহ মহাগুনা পাস, ১৮ হাজার ফুট উঁচু। ইতিমধ্যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। দিনের আলো কমে আসছে। হিমবাহের নীচে মাঝে মাঝে জলস্রোতের কল কল শব্দ শোনা যাচ্ছে। পথ বলে কিছু নেই। অন্যের পদচিহ্ন দেখে নামতে হচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সামানের পদচিহ্ন চোখে আসছে না। ধারে কাছে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছিল বিশ্বচরাচরে আমরা মাত্র দুইজনেই।

দূরে শেষনাগের তাঁবু বা চটিগুলির আলো দেখা যাচ্ছে, তবে সেও খুব একটা কাছে নয়। সঙ্গে ছোটো টর্চ ছিল। তাই টর্চ জ্বালিয়ে সামনের পদচিহ্ন ধরে অতি সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্তেই পদস্খলন হওয়ার সম্ভাবনা। অতিকষ্টে শেষ পর্যন্ত আমাদের রাত্রিযাপনের আশ্রয়স্থলে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ঘোড়সওয়ার বন্ধুরা তাঁবু ঠিক করে কম্বল বিছিয়ে রেখেছিল। তাই তাঁবুতে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে কম্বলে আশ্রয় নিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে ক্লান্তি কিছুটা প্রশমিত হলে নৈশাহার করে আবার কম্বলের নীচে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আজই পহেলগাঁও ফেরা যাবে।

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চা রুটি খেয়ে তৈরি হতেই আমাদের মোটবাহক ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া-সহ উপস্থিত। এখানে অন্য ঘোড়া দুটির ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। এবার চারজনই পদব্রজে গমন। শেষবারের মতো শেষনাগ দেখে নিলাম। অর্ধেক হ্রদের বেশি বরফাবৃত। পর্বতের ওপর থেকে একটা জলধারা নেমে এসেছে, তবে সেটও তুষারাবৃত। সেই বিদেশিদের তাঁবুটা আর দেখলাম না। আবার সেই মনোরম দৃশ্য। একদিকে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে চলার সরু উবড়ো খাবড়ো পথ। কখনও চড়াই, কখনও-বা উতরাই। পাশেই গভীর খাদ। একবার পড়লে গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকবো বাবা অমরনাথই জানেন। ওপরে নীলাকাশ আর দূরে সুউচ্চ সাদা তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। একটু নীচে মাঝে মাঝে মেষের পাল। মেশপালকরা মেষ চরাচ্ছে। নীচ দিয়ে লিডার নদী সঙ্গ নিয়েছে। বয়ে চলেছে সশব্দে। বেশ উৎফুল্ল মনেই হেঁটে চলেছি। পথচলতি মানুষজনের সঙ্গে দেখা হলেই 'জয় বাবা অমরনাথ' বা ওই ধরনের কিছু বলছি। এক বিদেশি পর্যটক পিঠে বিশাল এক বোঝা নিয়ে চলেছে। সামনাসামনি হতেই আমাদের উদ্দেশেই বলল 'নমস্তে'। আমরাও প্রত্যুত্তর দিলাম। ফেরার পথে সম্ভবত আমাদের হাঁটার গতি বেশি ছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই দুর্বিষহ, অনতিক্রমণীয়, মারাত্মক পিসুটপে। তবে এবার ছিল উতরাই অর্থাৎ নামা। কাজেই এবার কষ্টসাধ্য মনে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে এলাম। আবার সেই হিমবাহ, তবে অপরিষ্কার, কর্দমাক্ত। শেষ পর্যন্ত চন্দনওয়াড়ি এসে পৌঁছাল গেল। ততক্ষণে সূর্যিমামা বাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজন হয়নি। তাই হোটেলে ঢুকেই কিছু খেয়ে নিলাম। তখন পহেলগাঁও থেকে চন্দনওয়াড়ি পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তা ছিল। জঙ্গল থেকে গাছ কেটে ডালপালা ছেঁটে ট্রাকে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। অমরনাথ ফেরত যাত্রীরা অনুরোধ করলে তাদের ট্রাকে তুলে পহেলগাঁও পর্যন্ত নিয়ে যেত। আমাদের সেই ঘোড়সওয়ার বন্ধু দুজন ট্রাকে উঠে চলে গেল। আমরা দুজন স্থির করেছিলাম পুরোটাই হাঁটব। শেষ পর্যন্ত পহেলগাঁও এসে পৌঁছানো গেল। দুর্গাপুরে শাল বেচতে আসত, এমন এক শালওয়ালার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তারই এক দোকান ঘরে আমরা ঠাঁই নিলাম। আমরা সেখানেই রাত্রিবাস করা স্থির করেছিলাম। ঘোড়াওয়ালাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে ভাড়া নেওয়া তাঁবু আর আনুষঙ্গিক কিছু ফেরত দিয়ে দায়মুক্ত হলাম। পরেরদিন বাসে করে শ্রীনগর। সেখানে দুদিন কাটিয়ে মুঘলস গার্ডেন, ডাল লেক-সহ আরও কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বাসে করে জম্মু। পরে জম্মু থেকে ট্রেনে চেপে দুর্গাপুর। □

কালিয়াগঞ্জে ছাত্রী অপহরণ ও খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কালিয়াগঞ্জে গণধর্ষণের পর নাবালিকা ছাত্রীকে খুন প্রমাণ করছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে মহিলাদের কোনো নিরাপত্তাই নেই। উত্তরবঙ্গের মালদা ও দুই দিনাজপুরে বিগত চার পাঁচ বছরে পরপর লাভ জিহাদের নামে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা হতাশজনক এবং মানুষ পুলিশের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা জনজাতি ও রাজবংশী মহিলাদের উপর এইরকম ক্রমাগতভাবে পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগা অঞ্চলের গাঙ্গুয়া গ্রামের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ রাজবংশী ছাত্রী ডলি বর্মনকে গত ২০ এপ্রিল বিকালে পার্শ্ববর্তী কালুয়াডাঙা গ্রামের জাভেদ আখতার অপহরণ করে। সেই দিনই নিখোঁজ নাবালিকা ছাত্রীর খোঁজ পাওয়া গেলেও পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও স্থানীয় থানার এস আই দীপঙ্কর দাস নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলে নাবালিকার বাবা মাকে বিভ্রান্ত করে এবং মেয়েটিকে ফেরত না দিয়ে ছেলে পক্ষের কাছেই সারারাত থাকতে বাধ্য করে।

পরদিন সকালবেলায় ২১ এপ্রিল স্থানীয় একটি পুকুরে ডলি বর্মনকে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখা যায়। মেয়েটির পরিবারের দাবি ডলিকে জাভেদ আখতার ও তার চার-পাঁচ জন সঙ্গী মিলে গণধর্ষণ করে হত্যা করেছে। স্বভাবতই এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা সাহেবঘাটা মোড়ে মৃতদেহ নিয়ে পথ অবরোধ করে পুলিশ প্রশাসনের কাছে সুবিচার চাইছিল। কিন্তু দেখা গেল বিশাল পুলিশ বাহিনী কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে ও লাঠি চার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে মৃতদেহ মাটিতে ফেলে টেনে হিঁচড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের এই অমানবিক দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়া ও উলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় সবাই হতবাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে গণধর্ষণের পর পুলিশ একটি নাবালিকার মৃতদেহকে এভাবে পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে কি নিয়ে যেতে পারে? কেন মৃতদেহ সেই নাবালিকার মা-বাবার হাতে তুলে না দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো? তাহলে কী প্রমাণ লোপাট করার জন্য পুলিশের এই কুকীর্তি? শুধু তাই নয়, অবরোধকারীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ প্রমাণ করতে চাইলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তারা কত তৎপর। অথচ ২০ এপ্রিল রাত্রেই নাবালিকা মেয়েটিকে পুলিশ ইচ্ছে করলে উদ্ধার করতে পারতো। কিন্তু রাজ্য সরকারের তুষ্টিকরণের জঘন্য রাজনীতির জন্য হিন্দু মেয়েদের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। কেন বার বার কেবল হিন্দু মেয়েরাই গণধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়? অন্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর এরকম পৈশাচিক অত্যাচারের ঘটনা তো শোনা যায় না? এখন বুদ্ধিজীবীদের তো মোমবাতি হাতে বের হতে দেখা যায় না? এইসব সেকুলার পন্থীরা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু হলেই মায়া কান্না জুড়ে দেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে চিৎকার চেঁচামেচি করেন। কিন্তু হিন্দুদের বেলায় মানবাধিকার থাকে না। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কালিয়াগঞ্জে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন আসার কথা শোনা যাচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বিগত ৭-৮ বছরের মধ্যেই গঙ্গারামপুরের জবা রায় ও প্রমিলা বর্মন, চোরড়ার মাম্পি সিংহ, এই কালিয়াগঞ্জেরই সোমা সরকার এবং এখন ডলি বর্মন, আর কত হিন্দু মেয়েকে লাভ জিহাদের শিকার হয়ে অকালে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে? উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে দোষীদের আজ পর্যন্ত কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি।

আজ যখন উত্তরপ্রদেশে যোগী রাজ্যের এনকাউন্টারের কথা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে তখন এখানেও অপরাধীদের এনকাউন্টারের প্রয়োজন রয়েছে বলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মনে করছেন। কেননা উত্তরবঙ্গ-সহ সারা রাজ্যে আজ অপরাধীদের কোনো কঠোর শাস্তি হয় না, এরাজ্য এখন অপরাধী, মাফিয়া, ধর্ষক, চোরাচালানকারী ও জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মতো এখানেও বুলডোজার ও এনকাউন্টারের দরকার আছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলাতেও লাভ জিহাদের শিকার এক নাবালিকা গত তিন মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে। বাবা-মা দিনমজুর হওয়ার জন্য কেবলমাত্র অভিযোগ পত্র লিখেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। রতুয়া থানায় যোগাযোগ করা হলে আই সি বলেন, ভালোবাসা করে পালিয়ে গেলে কী ধরা যায়? কী অদ্ভুত যুক্তি? এই রকম পুলিশ থাকলে এ রাজ্যের হিন্দু মেয়েদের নিরাপত্তা বলে আর কিছু থাকবে না।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২০ এপ্রিল নতুন দিল্লির হোটেল অশোকে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি চিত্রপ্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং বুদ্ধমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি ১৯ জন বিশিষ্ট 'শ্রমণ'কে 'চিবর' বা সন্ন্যাসীর পবিত্র বস্ত্র দান করেন।

সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত প্রত্যেককে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, 'অতিথি দেব ভবঃ' অর্থাৎ অতিথি ভগবানের সমান। বুদ্ধর দেশ এই ভারতভূমির এটি একটি ঐতিহ্য। বুদ্ধর আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করছেন এমন বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং বুদ্ধই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বুদ্ধ ব্যক্তি-অতীত, এটি একটি ধারণা। বুদ্ধ একটি সংবেদনা যা একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে। তিনি একটি ভাবনা যা অবয়ব দেয়। এবং তিনি একটি ভাবনা যা অবয়ব দেয় এবং বুদ্ধ প্রতিরূপের ঊর্ধ্বে একটি সংজ্ঞা। বুদ্ধ সংজ্ঞা চিরায়ত। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত এত মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে বুদ্ধর প্রসার কতটা যা সমগ্র মানব সমাজকে একটি সূত্রে গেঁথে রেখেছে। সকল মানুষের মিলিত ইচ্ছা একটি শক্তি। ভগবান বুদ্ধর কোটি কোটি অনুগামীর সংকল্প বিশ্বের কল্যাণের জন্য। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নিজ বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, উদ্বোধনী আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন সব দেশের প্রয়াসের জন্য একটি কার্যকরি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশনকে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান।

শ্রী মোদী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেন, বাধনগরে, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানকার প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রে এসেছিলেন হিউয়েন সাং। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন সারা দেশ 'স্বাধীনতার অমৃতকাল' পালন করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ভবিষ্যতের জন্য একটি উদ্দেশ্য রেখেছে এবং বিশ্বকল্যাণে নতুন সংকল্প নিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আনর্জাতিক সাফল্যের পেছনে প্রেরণা হিসেবে আছেন ভগবান বুদ্ধ।

বৌদ্ধ ধর্ম, চর্চা এবং বোধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ৯ বছরে ভারত এই তিনটি বিষয়ই অনুসরণ করেছে। ভগবান বুদ্ধর শিক্ষার প্রসারে ভারত উৎসর্গীকৃতভাবে কাজ করেছে। তিনি ভারতে এবং নেপালে বৌদ্ধ সার্কিটগুলির উন্নয়নের কথা বলেন। সারনাথ এবং কুশীনগরের সংস্কার, কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আইবিসির সহযোগিতায় লুম্বিনীতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অব বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের মানবিকতার প্রতি সহমর্মিতার জন্য ভগবান বুদ্ধর শিক্ষাকেই কৃতিত্ব দেন। তিনি শান্তি মিশনের কথা বলেন এবং তুরস্কের ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুরোদস্তুর প্রয়াসের সঙ্গে উদ্ধার কাজের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, '১৪০ কোটি ভারতীয়ের এই অনুভব সারা বিশ্ব বুঝেছে এবং গ্রহণ করেছে।' তিনি আরও বলেন, আইবিসির মতো

প্ল্যাটফর্ম সম-মনস্ক দেশগুলিকে সুযোগ দিচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম এবং শান্তির প্রসারে।

'সমস্যা থেকে সমাধানে পৌঁছানোর যাত্রাই বুদ্ধর প্রকৃত যাত্রা।' ভগবান বুদ্ধর যাত্রাপথের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি দুর্গ এবং সাম্রাজ্যের জীবন ত্যাগ করেছিলেন কারণ তিনি অন্যের জীবনের দুঃখ অনুভব করতে পেরেছিলেন। সমৃদ্ধ পৃথিবীর লক্ষ্য পূরণের একমাত্র রাস্তা হলো আত্মসর্বস্ব হীনবুদ্ধি ত্যাগ করে বুদ্ধ মন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে বিশ্বের ভাবনাকে একাত্ম করে নেওয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি সুন্দর বিশ্ব তখনই হওয়া সম্ভব যদি আমরা সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করি। 'সময়ের দাবি, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে নিজ দেশের স্বার্থের পাশাপাশি সারা বিশ্বের স্বার্থকে।'

বর্তমান সময়টি হলো এই শতাব্দীর সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল সময়। চলছে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় কট্টরবাদ এবং তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা, বহু প্রাণীর বিলুপ্ত হওয়া ও হিমবাহের গলন। এর মধ্যে এমন মানুষও আছেন যাঁরা বুদ্ধদেবে বিশ্বাস রাখেন ও সমগ্র প্রাণীজগতের কল্যাণের কথা ভাবেন। এই আশা, এই বিশ্বাসই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি। যখন এই আশা সম্মিলিত হবে, তখন বুদ্ধ ধর্ম বিশ্বের বিশ্বাস হয়ে উঠবে, বুদ্ধর অনুভব সারা মানব সমাজের বিশ্বাস হয়ে উঠবে।

বুদ্ধর শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শ্রী মোদী বলেন, বর্তমানের সময়ের সব সমস্যার সমাধান ভগবান বুদ্ধর সেই প্রাচীন শিক্ষার মাধ্যমেই পাওয়া। ভগবান বুদ্ধ শান্তির জন্য যুদ্ধ, জয়-পরাজয়কে পরিহার করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শত্রুতা দিয়ে শত্রুতাকে জয় করা যায় না, একতাতেই সন্তুষ্টি। একইরকম ভাবে ভগবান বুদ্ধর শিক্ষা ছিল অপরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজের আচরণের দিকেও তাকানো। বর্তমানকালে একের চিন্তা অন্যের ওপর চাপানোর যে ধারা চলছে, তার জবাব হতে পারে এই শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বুদ্ধর বাণী 'অপ্প দীপো ভবঃ'তে ফিরে আসেন। ভগবান বুদ্ধের সেই চিরন্তন বাণী আজও প্রাসঙ্গিকতা। সেটি হলো— 'নিজেই নিজের আলোক হয়ে ওঠ'। কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি যা বলেছিলেন সে কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। 'আমরাই সেই দেশ যারা বিশ্বকে বুদ্ধ দিয়েছে, যুদ্ধ নয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৌদ্ধ পন্থাই ভবিষ্যতের পন্থা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের পন্থা। যদি বুদ্ধর বাণী অনুসরণ করত সারা বিশ্ব, তাহলে আজ এই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো না। এটির ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশগুলি একে অপরের কথা, আগামী প্রজন্মের কথা ভাবা বন্ধ করাতেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভুল-ত্রুটিগুলি জড়ো হয়ে আজ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। বুদ্ধ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সু-আচরণের বাণী প্রচার করেছিলেন যে আচরণে সার্বিক ভালো হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে একটি মানুষ যে কোনও ভাবেই হোক পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলে। সেটি তাঁর জীবনযাপন দিয়েই হোক, খাদ্যাভ্যাস দিয়ে হোক বা ভ্রমণেচ্ছা দিয়েই হোক। তেমনই প্রত্যেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইয়ে অবদান রাখতে পারে। পরিবেশের জন্য জীবনশৈলীর ওপর আলোকপাত করে অথবা 'মিশন LIFE'-এর যে উদ্যোগ ভারত নিয়েছে তা বুদ্ধ থেকে অনুপ্রেরণার প্রভাবেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি মানুষ সচেতন হয়ে তাঁদের জীবনশৈলী পরিবর্তন করেন, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিশাল সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বস্তুবাদ এবং স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে এসে 'ভবতু সব মঙ্গলম'-এর ধারণাকে আত্মস্থ করতে হবে। বুদ্ধকে প্রতীক হিসেবে শুধু নয়, জীবনে তাঁর দর্শনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, এই সংকল্প তখনই পূর্ণ হওয়া সম্ভব যখন আমরা বুদ্ধর বাণীগুলি মনে রাখব। পিছু না হেঁটে এগিয়ে যাব। শ্রী মোদী বলেন, এই সংকল্প সফল হবেই, যদি প্রত্যেকে একজোট হয়। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি, আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘোয়াল ও শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি এবং ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশনের মহাসচিব ড. ধম্মপিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪২।।

'হোয়াইট ফেস'কে ব্রহ্মচারীজী বলেছেন ধবল মুখ। পাহাড়ের বিষধর সাপ, হিংস্র হায়না, খর রৌদ্র, ঝড়-বৃষ্টি, অন্ধকার নির্জনতায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে ৮ দিন ছিল তাঁর একান্ত সাধনা।

ধবলমুখে বসেও ব্রহ্মচারিজীর বিশ্রাম ছিল না। সাংবাদিক, অধ্যাপক, পর্যটক, ধর্মযাজক বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মকথা বলেছেন ব্রহ্মচারীজী।

(ক্রমশ)